লীলাময়ী।

সামাজিক উপন্যাস।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা।

২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত

ও

৫ নং সিদ্ধেশ্বরচন্দ্রের লেন, চাঁপাতলা নিউক্যানিং প্রেসে

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সন ২৯৮ সাল।

মূল্য ৷৷০ আট আনা।০

উৎসর্গ পত্র।

গ্রন্থকারের আন্তরিক

ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ

সুহৃদবর শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত

মহাশয়ের করকমলে এই গ্রন্থ

উৎসর্গীকৃত হইল।
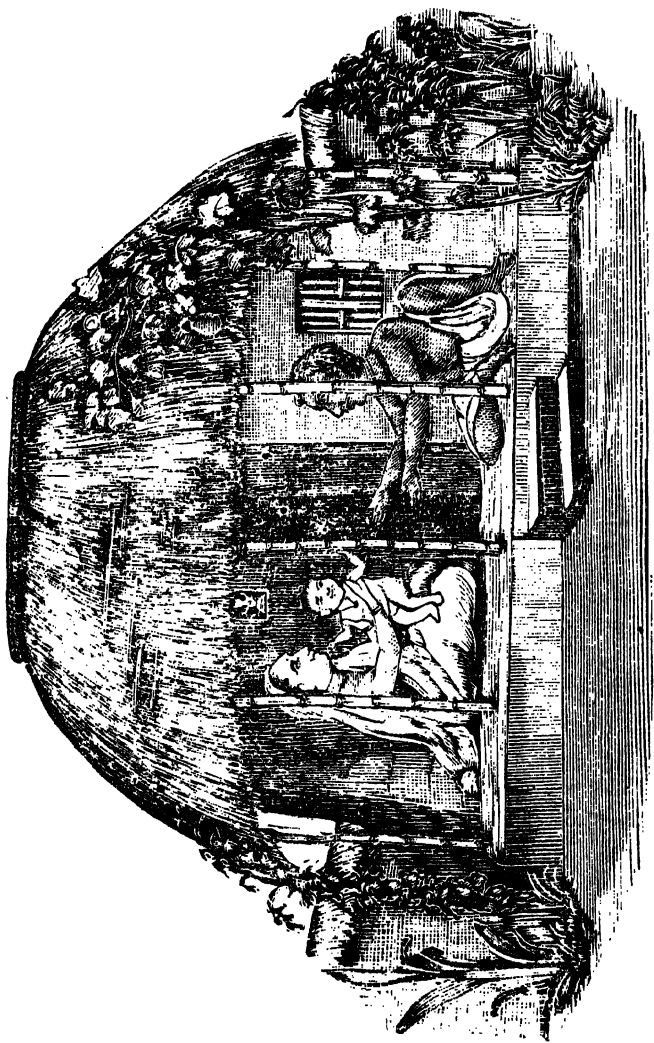
লীলাময়ী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।
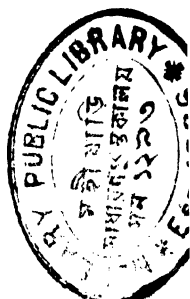
গ্রামের নাম বিজয়নগর। নামটী জমকাল বটে, কিন্তু গ্রামখানি অতি ক্ষুদ্র। তিন চারি ঘর ব্রাহ্মণ, পাঁচ সাত ঘর কায়স্থ, আর দশ পনর ঘর অন্যান্য জাতি, এই লইয়া বিজয়নগর গ্রাম। এই গ্রামে লোকনাথ ঘোষের নিবাস। লোকনাথ জাতিতে কুলীন কায়স্থ। অবস্থা অতি সামান্য, জমা জমীর বাৎসরিক আয় ত্রিশটি টাকা মাত্র। লোকনাথ কিন্তু এই অবস্থাতেই সুখী, কারণ লোকনাথ নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট। তাহার অবস্থাতিরিক্ত কোনরূপ উচ্চাভিলাষ ছিল না। হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা কাহাকে বলে লোকনাথ তাহা জানিত না। অর্দ্ধাশনেই হউক, কিম্বা পূর্ণাশনেই হউক, কোন প্রকারে দিন গেলেই লোকনাথের আনন্দের সীমা থাকিত না। তবে লোকনাথ স্বদেশের কিংবা সমাজের উন্নতির জন্য কোনরূপ

অনুষ্ঠান করিতে পারে নাই। দরিদ্র লোকনাথের নিকট স্বদেশ কিংবা সমাজ কি উন্নতির আশা করিতে পারে?

লোকনাথের ভার্য্যার নাম বিন্দুবাসিনী। বিন্দুবাসিনীর নামকরণের উপর যদি আমাদের কোন হাত থাকিত, তাহা হইলে আমরা তাহার নাম বিন্দুবাসিনী না রাখিয়া আনন্দময়ী রাখিতাম। বাস্তবিক বিন্দুবাসিনী সদাই হাস্যময়ী, দরিদ্র লোকনাথের ভার্য্যা এত হাসি কোথায় পাইত, অনেকেই তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিত না। সে হাসি অতি মধুর—অতি কোমল। সৌদামিনীর সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না, কারণ সৌদামিনী বড় অস্থির। জ্যোৎস্নার সহিতও তাহার তুলনা হইতে পারে না, কারণ জ্যোৎস্না বড় স্থির। অথচ সৌদামিনী অথবা জ্যোৎস্নায় যাহা আছে, এ হাসিতেও তাহা আছে। দরিদ্র লোকনাথের অন্ধকারময় হৃদয়ও অনেক সময় এই হাসি আলোকিত করিয়া রাখিত।

বিন্দুবাসিনী কেবল হাসিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিত না। সাংসারিক সমস্ত কাজকর্ম্ম স্বহস্তে করিত; এবং ইহা ব্যতীত কুলান অকুলানের প্রতিও দৃষ্টি রাখিত, সে কারণ সে হাসি লোকনাথের এত মধুর বোধ হইত। লোকনাথের গৃহের চারিধারে যে সকল সময়োপযোগী শাক্ সবজী শোভা করিয়া রহিয়াছে দেখিতেছ,সে সকল বিন্দুবাসিনীরই স্বহস্তে রোপিত ও আন্তরিক যত্নে বর্দ্ধিত। তাহাদ্বারা অনেকটা সংসারের কুলান অকুলানের সাহায্য হইত। কেবল শাক্ সবজী নয়, কাটনা কাটিয়াও বিন্দুবাসিনী সময়ে সময়ে লোকনাথকে অর্থ সাহায্য করিত। ফল কথা, বিন্দুবাসিনী তিলার্দ্ধ বিশ্রাম করিতে জানিত না। কোনপ্রকার

কাজ হাতে থাকিলেই বিন্দুবাসিনী অনন্দময়ী, আর কাজ হাতে না থাকিলেই বিন্দুবাসিনী বিষাদময়ী। ঘটনাক্রমে পীড়া বশতঃ যদি বিন্দুবাসিনীকে দুই এক দিন বিশ্রাম করিতে হইত, সে কয়েক দিন পীড়ার যন্ত্রণা অপেক্ষা বিশ্রামের যন্ত্রণা বিন্দুবাসিনীর পক্ষে অধিক কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইত।

সংসারে এই বিন্দুবাসিনী ব্যতীত লোকনাথের আর কেহই ছিল না। এই দরিদ্র দম্পতী সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান করিয়া প্রফুল্ল-মনে দিন অতিবাহিত করিত। ইহাদের মনে কোনরূপ কামনাই ছিল না; এমন কি মনুষ্য স্বভাবসিদ্ধ সন্তানকামনা পর্য্যন্ত তাহাদের মনে কখন উদয় হয় নাই। কিন্তু কামনা না থাকিলেও অনেক সময় কাম্যবস্তু লাভ হয়। এই দম্পতীর অদৃষ্টেও তাহা ঘটিল। ত্রিশ বৎসর বয়সে বিন্দুবাসিনী এক কন্যা প্রসব করিল। পরে সেই কন্যার নাম রাখা হইয়াছিল লীলাময়ী।

কন্যার মুখ দেখিয়া জননীর অপত্যস্নেহ একবারে উথলিয়া উঠিল, লোকনাথও আনন্দিত হইল বটে, কিন্তু সে আনন্দ বিন্দুবাসিনীর আনন্দস্রোতের সহিত মিলিতে পারিল না। কারণ, কন্যাকে কিরূপে লালন পালন করিবে, এই চিন্তা তখন লোকনাথের মনে উদয় হইয়াছিল! এত দিন দরিদ্র হইয়াও দরিদ্রযন্ত্রণা কাহাকে বলে,লোকনাথ তাহা জানিত না। যে নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট, তাহার আবার দরিদ্রযন্ত্রণা কেন থাকিবে?

পূর্ব্বে আপনার হীনাবস্থার বিষয় লোকনাথের চিন্তার বহির্ভূত ছিল, কন্যা জন্মিবার পর কিন্তু লোকনাথের মনে সে কথা জাগিয়া উঠিল। সুতরাং এইবার একটা অপরিবর্ত্তনশীল মনের পরিবর্ত্তন ঘটিল। বিন্দুবাসিনীর মনে কিন্তু সেরূপ কোন

চিন্তাই উদয় হয় নাই, সেই কারণ তাহার আনন্দস্রোত অবাধে তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারিয়াছিল। সেই অপত্য-স্নেহ পরিপূর্ণ চিরপ্রফুল্ল কোমল হৃদয়ে কি সেরূপ কোন চিন্তার স্থান হইতে পারে?

কন্যার বয়স যখন পাঁচমাস, তখন একদিন বৈকালে বিন্দু-বাসিনী ঘরের দাওয়াতে বসিয়া কন্যাকে আদর করিতেছিল, শিশুকন্যাটি প্রৌঢ়া বিন্দুবাসিনীর অনুকরণে ক্ষুদ্র অধরে ক্ষুদ্র হাসির লহরী তুলিতেছিল। সে লহরী ক্ষুদ্র হইলেও তাহা বিন্দুবাসিনীর হৃদয়ে গিয়া আঘাত করিতেছিল। নিকটেই লোকনাথ বসিয়া অন্যমনস্কে কি চিন্তা করিতেছিল। বিন্দুবাসিনীর আনন্দসাগর তখন উথলিয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং লোকনাথকে সে আনন্দের অংশী করিবার জন্য বলিল—"বসে কি ভাবছ? একবার চেয়ে দেখ, আমার সোণারচাঁদ তোমার আঁধার ঘর কেমন আলো করে রয়েছে।"

লোকনাথের তখন অন্য চিন্তা দূরে গেল, লোকনাথ কন্যার প্রতি সস্নেহ নয়নে চাহিল। অমনি কন্যাটি পুনরায় হাসির লহরী তুলিল, সে লহরী এবার লোকনাথের হৃদয়েও গিয়া পৌঁছিল, লোকনাথ তখন আর থাকিতে পারিল না, আনন্দে অধীর হইয়া কন্যার মুখচুম্বন করিল। বিন্দুবাসিনী সে দৃশ্য দেখিয়া কি চুপ করিয়া থাকিতে পারে? বিন্দুবাসিনী ও আনন্দে বিহ্বল, সে আনন্দের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া কন্যার সেই সুকোমল অধর একবারে অসংখ্য চুম্বনে আরক্তিম করিল। চুম্বনে সে বেগের কথঞ্চিৎ হ্রাস হইলে বিন্দুবাসিনী

বলিল—"এ চাঁদ যার ঘর আলো করে থাকে, তার আবার কিসের ভাবনা ?"

লোকনাথের মুখ আরো প্রফুল্ল হইল, কিন্তু দেখিতে দেখিতে এই সময় তাহার গণ্ডস্থল বাহিয়া দুই এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। সে অশ্রু মুছিয়া লোকনাথ বলিল—"আবার কিসের ভাবনা বিন্দু ? কেবল তোমার ঐ চাঁদেরই ভাবনা। আমি ভাবছিলাম, আজ একটু দুধ কোথায় পাই।"

বিন্দু। দেখ, আমার স্তনের দুধে বাছার আর কুলায় না, একটু দুধ কিন্তু চাই। তুমি আর বসে ভেবো না, একবার সে চেষ্টায় যাও।

লোক। কিন্তু যাই কোথায় ? পয়সা না পেলে কে আমায় দুধ দেবে ?

বিন্দু। পরমেশ্বর যদি আমার বাছার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্তনের দুধ বাড়িয়ে দিতেন, তা হলে আর এ ভাবনা থাকতো না।

লোক। তোমার স্তনের দুধ বাড়বে কোথা থেকে ? এখন কি আমি তোমায় তেমন খেতে দিতে পারি ? প্রসব হয়ে পর্য্যন্ত তুমি প্রায় আধপেটাই খাও।

বিন্দু। তা হ'ক। যদি আমার সোণার চাঁদের কোন কষ্ট না হয়, তা হ'লে আমি এখন যা খাই, তার অর্দ্ধেক খেয়েও সুখে থাকতে পারি।

লোক। তা হ'লে কি করে বাঁচবে ?

বিন্দু। কেন বাঁচবো না ? আমার শরীরের রক্ত মেপে নিয়ে কেউ যদি আমার বাছাকে সেই মাপে দুধ দেয়, তা হ'লেও

আমার কোন কষ্ট হবে না—তা হলেও আমি মরবো না। এ চাঁদমুখ দেখলে কি আবার মরতে ইচ্ছা করে?

লোক। কষ্ট না হতে পারে, কিন্তু মৃত্যু কারো ইচ্ছাধীন নয়।

বিন্দু। আচ্ছা, এক কর্ম্ম কর না। জিনিষ পত্র যা কিছু আছে, বেচে কিনে আমার সোণার চাঁদকে দুধ খাওয়াও না।

লোক। জিনিষ পত্র আর কি আছে? কেবল ঘটী, বাটী, তা না থাক্‌লে কি আর সংসার চলে?

বিন্দু। কেন চলবে না? পিত্তল কাঁসার ঘটিতে জল খেলেও যে স্বাদ, মাটির ঘটীতে জল খেলেও সেই স্বাদ, আর ঘাটে গিয়া আঁচলা করে জল খেলেও সেই স্বাদ, তবে কেন চলবে না?

তখন অকস্মাৎ লোকনাথ অগাধ চিন্তাসাগরের যেন কুল পাইল। আর কোন কথা না কহিয়া একটী ঘটী হস্তে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এইরূপ দুঃখে ও কষ্টে লীলাময়ী প্রতিপালিতা হইতে লাগিল। আমরা জানি, লীলাময়ী কিন্তু কোনরূপ দুঃখ বা কষ্ট পায় নাই, কারণ তাহার জনকজননী লীলার জন্য সকল দুঃখ ও কষ্ট অম্লানবদনে সহ্য করিতে পারিত। আর লীলার কোনরূপ অভাব হইলে, বিন্দুবাসিনীর আদর ও যত্নে সে অভাব

পূরণ হইয়া যাইত। দরিদ্র লোকনাথের কন্যা লীলাময়ীর আদর ও যত্নের কথা শুনিয়া হয় ত অনেকেই হাসিবেন, কিন্তু আমরা এ কথা উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারি যে, দরিদ্রের কন্যা লীলাময়ী যেরূপ আদর ও যত্নে প্রতিপালিত হইতেছিল, অসংখ্য দাস দাসীর দ্বারা প্রতিপালিত রাজকন্যাও সেরূপ আদর ও যত্ন কখন পায় নাই।

লীলা যখন আধ আধ কথায় 'মা-মা, বা-বা' বলিত, তাহার জনক-জননীও সে সময় সকল দুঃখ ও সকল কষ্ট ভুলিয়া গিয়া অপার সুখসাগরে সন্তরণ করিত। বিন্দুবাসিনী লীলাকে কোলে লইয়া সাংসারিক প্রায় সকল কর্ম্মই করিতে পারিত, সময়ে সময়ে লোকনাথের কোলে গিয়াও সেই ক্ষুদ্র শিশু ক্ষুদ্র হাসির লহরী তুলিত। এই কোল-পরিবর্ত্তনের সময় লীলার আনন্দ দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিবার জন্যই কেবল লোকনাথকে সময়ে সময়ে কন্যা কোলে লইতে হইত। লীলা কিন্তু অধিক-ক্ষণ পিতার কোলে স্থির থাকিতে পারিত না, অল্পক্ষণ পরেই জননীর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পুনরায় হাসির লহরী তুলিত। জননীর কোল হইতে পিতার কোল এবং পিতার কোল হইতে জননীর কোল এইরূপ কোল-পরিবর্ত্তনে সেই বালিকা যে কি আনন্দ অনুভব করিত, তাহা তাহার জনকজননী কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিত না।

ক্রমে যখন লীলার বয়স দেড় বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেল, লীলা পা পা করিয়া হাঁটিতে শিখিল, তখন আর লীলাকে সর্ব্ব-দাই কোলে লইয়া থাকিতে হইত না। জননী যখন গৃহকর্ম্ম করিত, লীলা সে সময়ে তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে

ঘুরিত। জননী যখন চর্‌কা কাটিতে আরম্ভ করিত, লীলা তখন এক পার্শ্বে বসিয়া সেই ঘুর্ণীত চর্‌কার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত, এবং তাহার মধুর শব্দে বিমোহিত হইত। এই শিশু কন্যার প্রকৃতি দেখিয়া জনকজননী বিস্মিত হইত। লীলাকে কেহ কখন কাঁদিতে দেখে নাই, এমন কি ক্ষুধায় অস্থির হইলেও সে কখন কাঁদিতে জানিত না। লীলার এই সকল অসাধারণ গুণের কথা ভাবিতে ভাবিতে কিন্তু অনেক সময় তাহার জনক-জননী কাঁদিয়া ফেলিত। জনক জননীর চক্ষে জল দেখিলেই কিন্তু লীলা অস্থির হইয়া "মা চুপ কল, বাবা চুপ কল্" বলিয়া আব্‌দার করিত। অন্য কোন কারণে অন্য কোন প্রকার শিশুসুলভ আব্‌দার করিতে আমরা লীলাকে কখনও দেখি নাই!

লীলার বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন একদিনকার বৈকালের ঘটনার কথা বলি শুন। পল্লীগ্রামের সামান্য অবস্থার স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই বৈকালে গাত্র ধৌত করিয়া গৃহপ্রাঙ্গনস্থ নানা প্রকার শাকশব্‌জী ও বৃক্ষাদিতে জলসিঞ্চন করিয়া থাকে। বিন্দু-বাসিনীও একদিন এইরূপ বৈকালে জলসিঞ্চন করিতেছিলেন, জননীর দৃষ্টান্তের অনুকরণে লীলাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র কক্ষে একটি ক্ষুদ্র কলসী লইয়া জলসিঞ্চন আরম্ভ করিল। লীলাকে এইরূপ গুরুতর পরিশ্রম করিতে নিষেধ করিয়া বিন্দুবাসিনী বলিল, "লীলা, তুমি কেন মা, আমার সঙ্গে সঙ্গে গাছে জল দিতে এসেছ?" লীলা তখন প্রফুল্লমুখে ধীরে ধীরে উত্তর করিল— "আমি একলা ব'সে কি করব মা?"

বিন্দু। তুমি বোসেদের খুদীর সঙ্গে খেলা কর না গে মা।

লীলা। না মা, আমি খুদীর সঙ্গে খেলা কর্‌বো না মা,—আমি তোর সঙ্গে খেলা কর্‌বো। তুইও গাছে জল দে, আমিও তোর সঙ্গে সঙ্গে গাছে জল দি—এ যে বেশ খেলা মা।

বালিকার কথা শুনিয়া বিন্দুবাসিনী অনেকক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিল। তাহার পর পুনরায় বলিল—"হা আবাগি! একি তোর খেলা? দুঃখিনীর গর্ভে জন্মেছিস্ বলে কি বিধাতা তোকে এমন খেলা খেল্‌তে শিখিয়ে দিয়েছিল?"

লীলা এইবার আগ্রহের সহিত বলিল—"হাঁ মা, তুই আর বাবা অনেক সময় দুঃখ—দুঃখ করিস্, তা দুঃখ কাকে বলে মা? তোর পায়ে পড়ি—দুঃখ কাকে বলে বল্‌না মা?"

মূর্ত্তিমান দুঃখের ক্রোড়ে পালিতা বালিকার মুখে এরূপ প্রশ্ন শুনিয়া তখন জননীর চক্ষে জল আসিল, কিন্তু তিনি তখন সে জল গোপন করিয়া বলিলেন—"বড় হ'লে মা, দুঃখ দেখ্‌তে পাবে, ছোট বেলায় কেউ সে দুঃখকে দেখ্‌তে পায় না।"

লীলা। আমি ত মা বড় হ'য়েছি। বাবা যে সে দিন বলেছিলেন, "আমার লীলা এখন বড় হয়েছে।"

বিন্দু। আরো বড় হও মা, তখন সব বুঝ্‌তে পার্‌বে। তখন আমার মতন গাছে জল দিও, সংসারের কাজকর্ম্ম করো, এখন তোমার যে কষ্ট হবে মা।

লীলা। মা, এতে তোর কি কষ্ট হয়?

বিন্দু। না।

লীলা। তবে আমার হ'বে কেন?

বিন্দু। কষ্ট না হউক, জল ঘেঁটে তোমার যদি অসুখ করে মা।

বালিকার ইতঃপূর্ব্বে একবার অসুখ করিয়াছিল, সুতরাং বালিকা অসুখের যন্ত্রণা বিলক্ষণ জানিত। এইবার জননীর কথা শুনিয়া বালিকার চক্ষু দুটী ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। বালিকা ছল ছল নেত্রে বলিল—"হাঁ মা, তবে জল ঘেঁটে ঘেঁটে তোরও অসুখ হ'তে পারে।"

আবার বস্ত্রাঞ্চলে কন্যার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া জননী বলিল—"না মা, এতে আমার অসুখ হবে না।"

জননীর কথা শুনিয়া বালিকা এবার একটু বিস্মিত হইয়া বলিল—"তবে আমার হ'বে কেন?"

বিন্দুবাসিনী কিন্তু এ 'কেনর' আর উত্তর দিতে পারিল না। তখন মাতাকন্যায় একত্রে জলসিঞ্চন আরম্ভ করিল। মাতা বড় কলসী কক্ষে নিকটস্থ পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া লাউ, কুমড়া, শাক প্রভৃতি এবং অন্যান্য বৃক্ষ সকলে জলসিঞ্চন করিতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে লীলাময়ীও একটি ক্ষুদ্র কলসী কক্ষে লইয়া মাতার অনুকরণে জলসিঞ্চন করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে লীলাময়ী এত অল্প বয়স হইতেই মাতাকে সকল প্রকার গৃহকর্ম্মে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে শিখিল। ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অন্যান্য বালিকার ন্যায় লীলা খেলিয়া বেড়াইত না। কোন বালক বালিকা লীলাকে খেলিতে ডাকিলেও প্রায় লীলা তাহাদের সহিত খেলিতে যাইত না। সে কেবল মাতার সহিত গৃহকর্ম্মের খেলা খেলিতে ভাল বাসিত। সন্ধ্যার সময় চন্দ্রের আলোতে বিন্দুবাসিনী যখন সূতা কাটিতে বসিত, লীলা তখন ধীরে ধীরে জননীর নিকট বসিয়া তুলা পিঁজিতে

আরম্ভ করিত। ক্রমে বালিকা মাতার নিকট হইতে সূতা লইয়া নিকটস্থ বাজারে বিক্রয় করিয়া আসিতে শিখিয়াছিল। একজন প্রতিবাসিনী লীলাকে এই কার্য্যে সাহায্য করিত, সে নীচবংশীয়া হইলেও লীলা তাহাকে 'দিদি' বলিয়া ডাকিত।

ৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এইরূপে লীলা শৈশবেই নিত্যসন্তোষময়ী জননীর মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে লাগিল। অন্যান্য বালকবালিকার ন্যায় লীলা এই বয়সেই ছেলে খেলা ভাল বাসিত না। গ্রামের কোন বালক বালিকা খেলিতে ডাকিলে যদিও দৈবাৎ কখন লীলা তাহাদের সঙ্গে খেলিতে বাধ্য হইত, কিন্তু সে সকল খেলা লীলা অধিকক্ষণ খেলিতে পারিত না। ক্রমে লীলা অন্য খেলা একবারে পরিত্যাগ করিয়া জননীর অনুকরণে সাংসারিক সকল কর্ম্ম করিতে শিখিল। জননী কোন কাজ করিতে না দিলে লীলার সেই প্রফুল্ল মুখকমল বিষণ্ণ হইত, কিছুক্ষণ কোনরূপ কাজ করিতে না পাইলে লীলা অস্থির হইয়া পড়িত।

পূর্ব্বে বিন্দুবাসিনী সূতা কাটিয়া হাটে বিক্রয় করিবার জন্য কোন নীচবংশীয়া স্ত্রীলোকের সাহায্য গ্রহণ করিত। সে অনুগ্রহ করিয়া যাহা কিছু দিত, বিন্দুবাসিনী তাহাই যথেষ্ট মনে করিত। এখন কিন্তু লীলা নিজে সেই কর্ম্মের ভার লইয়াছে, গ্রামের সেই নীচ বংশীয়া স্ত্রীলোকের সঙ্গে লীলা প্রতি হাটবারে সূতা বিক্রয় করিতে হাটে যাইত, এবং সূতা বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাইত, আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে গৃহে আসিয়া

জননীর অঞ্চলে বাঁধিয়া দিত। এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দরে স্থতা বিক্রয় হইতেছে দেখিয়া জননীও বিস্মিতনেত্রে লীলার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিত।

একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে এইরূপ হাট হইতে স্থতা বিক্রয় করিয়া লীলা গৃহে ফিরিয়া আসিতেছে, এমন সময় হঠাৎ আকাশে একখানি কাল মেঘ উঠিয়া ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সুতরাং লীলা ও তাহার সঙ্গিগণ যে যেখানে পাইল, একস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্যক্রমে জানি না, সম্মুখে এক অট্টালিকা দেখিয়া লীলা সেই অট্টালিকার বারান্দার নিম্নে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

ঝড় ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল দেখিয়া ঐ অট্টালিকার বৈঠকখানায় যে বাবু বসিয়াছিলেন, তিনি জানালা বন্ধ করিতে গেলেন, কিন্তু জানালা বন্ধ করিতে গিয়া দেখিলেন, একটী অষ্টম বৎসরের স্থন্দরী বালিকা সেই জানালার বাহিরে জল ঝড়ে বড়ই কষ্ট পাইতেছে। জলের ঝাপ্‌টায় বালিকার পরিধেয় বস্ত্র ভিজিয়া যাইতেছে, বালিকা ভীতমনে দেওয়ালের গায়ে জড়সড় হইয়া রহিয়াছে। এই সময় বালিকা একবার জানালার দিকে চাহিল। আ মরি! মরি! একি মর্ত্ত্যলোকের বালিকা, না বালিকাবেশে কোন স্বর্গীয়া দেবী? বাবুর আর জানালা বন্ধ করা হইল না, একদৃষ্টে সেই অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যময়ী বালিকাকে দেখিতে লাগিলেন। কি দেখিলেন—দেখিলেন সিঞ্চিতজল-কণা বালিকার সুকৃষ্ণ কেশগুচ্ছের উপর পড়িয়া যেন অসংখ্য শুভ্র মুক্তাফলের অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। আর সেই ভীতিসঙ্কুচিত মুখমণ্ডলেরই বা কি অপূর্ব্ব শোভা!

এই সময় বাবুর চৈতন্য হইল, বাবু সেই বালিকাকে গৃহের মধ্যে আসিতে বলিলেন। বালিকা কিন্তু তাহাতে যেন আরও ভীত হইল, কারণ সেই সুসজ্জিত গৃহের মধ্যে আসিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। এই সময় একজন ভৃত্য সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, বাবু বালিকাকে গৃহে আনিতে সেই ভৃত্যকে অনুমতি করিলেন। ভৃত্য বাহিরে গিয়া একবার ডাকিবামাত্র বালিকা তাহার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু গৃহের মধ্যে আসিল। ভৃত্য বালিকার পরিচিত ছিল। বাবু প্রথমেই ভৃত্যকে একখানি কাপড় আনিতে বলিলেন, বালিকার সেই আদ্রবস্ত্রখানি পরিবর্ত্তনের জন্যই সেই কাপড় আনিতে বলা হইয়াছিল। বালিকা কিন্তু কোন ক্রমেই বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে রাজি হইল না। এই সময় সেই গৃহে আর এক ব্যক্তি প্রবেশ করিল। আগন্তুক প্রবেশ করিয়াই বলিল—"কি সোমনাথ বাবু, লীলাকে কোথায় পেলে ?"

আমাদের প্রথম পরিচিত বাবুটির নাম সোমনাথ। সোমনাথ কলিকাতার কালেজে পড়েন। কলিকাতা হইতে তাঁহার সমপাঠী বন্ধু নরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন। এই নব আগন্তুক বাবুটিই তাঁহার সেই সমপাঠী বন্ধু নরেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্রনাথের প্রশ্নে সোমনাথ বলিলেন—"তুমি কি এ মেয়েটিকে চেন ?"

নরে। এ মেয়েটি পশ্চিম পাড়ার লোকনাথের কন্যা। লোকনাথ অতি গরীব, কিন্তু এমন ভাল লোক এ গ্রামে আর নাই। তার স্ত্রী আর এই কন্যা ছাড়া আর কেউ নাই, এরাও খুব ভাল, গ্রামশুদ্ধ লোক এদের সুখ্যাতি করে থাকে।

তাহার পর বালিকার প্রতি চাহিয়া নরেন্দ্র বাবু বলিলেন—“তুই এই জল ঝড়ে কোথায় গিয়েছিলি গো ?”

লীলা তখন সাহস করিয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিল—“আমি হাটে গিয়েছিলাম।”

নরে। আজ তো সীতাপুরের হাট—এখান হ'তে প্রায় এক ক্রোশ পথ, অত দূরে কিসের জন্য গিয়েছিলি ?

লীলা। সূতো বেচ্‌তে।

লীলার কথা শুনিয়া সোমনাথ বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—“এত ছোট মেয়ে অতদূর সূতো বেচ্‌তে গিয়েছিল ! এরা কি জাত ?”

নরেন্দ্র বাবু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—“কায়স্থ। আপনাদিগেরই স্বজাতি।”

সোম। এর আর কে আছে ?

নরে। সে কথাত পূর্ব্বেই বলেছি—কেবল বাপ মা আছে, আর কেউ নাই। মেয়েটিও তাঁদের বড় আদরের।

সোম। আদরের প্রমাণ সূতো বেচ্‌তে পাঠানতেই প্রকাশ পেয়েছে।

নরে। না হে শুনেছি মেয়েটি বড় পরিশ্রমী। এই বয়সেই সংসারের সমস্ত কাজকর্ম্ম শিখেছে। আপ্‌নি ইচ্ছা করেই নাকি এই সকল কাজ করে; কারণ এদের অবস্থা অতি শোচনীয়।

নরেন্দ্র বাবুর সহিত সোমনাথ বাবুর যখন এই সকল কথা হইতেছিল, তখন লীলা অবাক্ হইয়া সোমনাথ বাবুর মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল, হঠাৎ এই সময় সোমনাথ বাবুর দৃষ্টি লীলার মুখের প্রতি পড়িল। তিনি

প্রথমে বালিকার রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে এই অসাধারণ বালিকার গুণের কথা শুনিয়া অধিকতর বিস্মিত হইলেন। বালিকার প্রতি তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি জন্মাইল। তিনি লীলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ সূতা বেচে কি পেয়েছ?"

লীলা আদ্রবস্ত্রের অঞ্চলে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ কয়েক আনার পয়সা দেখাইল। সোমনাথ বাবু তখন আপনার পকেট হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া লীলার সেই বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া দিতে গেলেন, লীলা কিন্তু কোন মতেই সেই টাকা লইতে স্বীকৃতা হইল না। লীলার সেই প্রফুল্ল মুখ হঠাৎ যেন মলিন হইয়া গেল। লীলা ধীরে ধীরে বলিল—"আমি টাকা চাই না।"

নরেন্দ্র বাবু বলিলেন—"লীলা, যখন বাবু তোমায় দিচ্ছেন, তখন তুমি নিতে পার, এতে কোন দোষ নাই।"

লীলা উত্তর করিল—"মা বলেছেন কেবল সূতা বেচে টাকা পয়সা নিতে আছে, অম্‌নি কারো কাছ থেকে টাকা কি পয়সা নিতে নাই।"

সোমনাথ বাবু বালিকার কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"দেখ লীলা, আমার কিছু সূতার বড় দরকার, তুমি আমায় সূতা বেচবে?"

লীলার মুখ পুনরায় প্রফুল্ল হইল, লীলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া আপন পরিধেয় বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত একটি সূতার পুঁটুলি বাহির করিল। সোমনাথ বাবু হাসিতে হাসিতে সেই পুঁটুলিটী লইয়া লীলাকে পাঁচটি টাকা দিলেন। কিন্তু এবারও লীলা বলিল—"আমি টাকা নেব না, এর দাম সাড়ে চার আনার পয়সা!"

সোম। তুমি ছেলে মানুষ, তুমি কি এর দাম জান? এর দাম পাঁচ টাকা।

লীলা। আমি এর দর বেশ জানি। সাড়ে চার আনা কি কোন হাটে বড় জোর পাঁচ আনা হয়। এর বেশী কখন হয় না। ওগো স্থতো বেচে কখন একটা টাকাও পাই নি। আর আমাদের টাকার কখন দরকার হয় না, পয়সা হলেই আমাদের খরচ চলে। আমি টাকা নিয়ে কি কর্‌বো?

সোম। তোমার মাকে দিও।

লীলা। মা টাকা নিয়ে কি কর্‌বে? কই মার কাছে কখ-নত একটিও টাকা দেখিনি। তবে খাজনা দেবার সময় হলে বাবা পয়সা জমিয়ে টাকা করে, তবে খাজনা দেয়।

সোম। তবে এ টাকা তোমার বাপকেই খাজনা দেবার জন্যই দিও।

লীলা। সে দিন যে খাজনা দেওয়া হয়ে গেছে, এ বৎসর ত আর খাজনা দিতে হবে না।

"তবে আমি তোমার স্থতা চাই না।" বলিয়া সোমনাথ বাবু সেই পুঁটুলিটী পুনরায় বাঁধিয়া দিলেন, কিন্তু বাঁধিয়া দিবার সময় বালিকার অজ্ঞাতে একখানি নোট সেই পুঁটুলির মধ্যে রাখিয়া দিলেন। তাহা দেখিয়া নরেন্দ্র বাবু কি বলিতে যাইতে-ছিলেন, কিন্তু সোমনাথ বাবু ইঙ্গিতের দ্বারা তাঁহাকে কোন কথা বলিতে নিষেধ করিলেন।

তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল, স্থতরাং লীলা আর সেখানে অপেক্ষা না করিয়া ধীরে ধীরে গৃহে চলিল। এই সময় নরেন্দ্র নাথ বিস্মিত নেত্রে দেখিলেন সোমনাথ বাবু তখনও এক দৃষ্টে

লীলার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন, আর তাঁহার গণ্ডস্থল হইতে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িতেছে!

নরেন্দ্রনাথ সোমনাথের প্রকৃতি জানিতেন, সুতরাং তৎক্ষণাৎ সে অশ্রুজলের অর্থ বুঝিলেন। অনেকক্ষণ উভয়েই নীরব, তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া পুনরায় ঐ অসাধারণ বালিকার কথাই হইতে লাগিল।

এখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে ভয়ানক বৃষ্টি হইয়া গেলেও এখনও আকাশ পরিষ্কার হয় নাই। মধ্যে মধ্যে মেঘের গর্জ্জন ও বিদ্যুতের আলো সকলকে চমকিত করিতেছে। ভেক ও ঝিঝি পোকার রবে চারিদিক কম্পিত হইতেছে। ক্রমে অন্ধকার চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেন জমাট বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় সেই অন্ধকাররাশি ঠেলিয়া সেই ক্ষুদ্র বালিকা লীলাময়ী পুনরায় সেই বৈঠকখানায় আসিয়া দাঁড়াইল। নরেন্দ্রনাথ ও সোমনাথ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখেন যে, সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তির পশ্চাতেই সেই বালিকার পিতা লোকনাথ ঘোষ। নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঘোষজা মহাশয় কি মনে করে?"

লোকনাথ নরেন্দ্রনাথকে প্রাতঃপ্রণাম করিয়া বলিল—"নগেন বাবু, লীলার সূতার পুঁটুলির ভিতর একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট পাওয়া গিয়েছে, লীলার মুখে যে সকল কথা শুনেছি, তাতে সে নোট খানি আপনাদেরই বলে বোধ হয়, দেখুন দেখি এনোট খানি আপনাদের কি না?"

এই বলিয়া লোকনাথ একখানি নোট বাহির করিয়া দেখা-ইল। তাহার পর অতি বিনীতভাবে বলিল—"আমায় ক্ষমা কর্-

বেন, ভিজে সূতার সঙ্গে ছিল বলে নোট খানি ভিজে গিয়েছে, এতে কি কোন ক্ষতি হবে? দিনের বেলা হলে রৌদ্রে শুকিয়ে দিতে পারতাম, আগুনে কি প্রদীপের আলোয় শুকুতে আমার ভরসা হলো না।"

লোকনাথের কথা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ সোমনাথের মুখের দিকে চাহিলেন, সোমনাথ বাবু তখন বলিলেন—"ও নোট আমি আপনার কন্যাকে দিয়াছি।"

লোকনাথের মুখে আর কথা নাই, তিনি অবাক্ হইয়া সেই অপরিচিত বাবুটীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন—"মহাশয়, আমরা অতি গরীব বটে, কিন্তু কখন ভিক্ষা করি না।" তাহার পর বালিকার প্রতি চাহিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ মা লীলা, তুমি কি এই বাবুর কাছে কিছু চেয়ে ছিলে?"

লীলার মুখখানি অমনি শুকাইয়া গেল, হঠাৎ এই সময় একটী বাতাস আসিয়া কিন্তু সেই শুকান মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। লীলা ডান হস্তে ধীরে ধীরে চুলগুলি সরাইয়া দিয়া বলিল—"না বাবা, আমিত বাবুর কাছে কিছুই চাইনি।"

সোমনাথ বাবু বলিলেন—"না লীলা, তুমি আমার কাছে কিছুই চাও নাই। কিন্তু মনে কর না কেন, তুমি আমার একটি ছোট বোন, ছোটবোন না চাইলে কি বড় ভাই তাকে কিছু দেয় না?"

লীলা এইবার আহ্লাদিত হইয়া বলিল—"হাঁ বাবা, ইনি কি আমার ভাই? আমি ত কখন ভাই দেখিনি।"

লোকনাথ বলিল—"আমি বুঝেছি, আমাদের দুঃখের কথা

শুনে আপনার দয়া হয়েছে। কিন্তু দেখুন আমরা দুঃখী বটে, কিন্তু এখনও খেটে খেতে পারি, আমায় ক্ষমা করুন, আপনার এ দান আমি নেব না। এমন অনেক অন্ধ অতুর দুঃখী আছে, যারা খেটে খেতে পারে না, আপনি এ টাকা তাদের দেবেন, আপনার দান সার্থক হবে।”

সোমনাথ বাবু একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন—“না মহাশয়, আপনি সেরূপ ভাব্‌বেন না। আমি ও টাকা আপনাকেত দিই নাই, ও টাকা আপনার কন্যাকেই দিয়েছি।”

লোক। আজ্ঞে, কন্যাকে দিলেই আমাকে দেওয়া হলো।

সোম। না হয় আপনি ও টাকা নাই খরচ কর্‌লেন।

লোক। তবে ও টাকায় কি কর্‌বো ?

সোম। আপ্‌নার অমন সুন্দর মেয়ে, গায়ে কিন্তু একখানিও গহনা নাই, আপনি না হয়, একখানা গহনা গড়িয়ে আপনার মেয়েকে দিবেন।

লোক। আজ্ঞে, গহনা পরেত আর কোন লাভ দেখ্‌তে পাইনে, কেবল চোরের দৌরাত্ম বাড়ান হবে। এখন নির্ভয়ে রাত্রে ঘুমুতে পারি, তখন আর রাত্রে ঘুম হবে না।

এই সময় নরেন্দ্রনাথ বলিলেন “ঘোষজা মহাশয়, বাবু যখন লীলাকে ও টাকা দিয়েছেন, তখন আপ্‌নার নেওয়ায় কোন হানি নাই। মনে করুন, এখন যেন চোরের ভয়ে লীলাকে গহনা দিলেন না, কিন্তু লীলার বিবাহের সময় তাকে গহনা না দিলেত ভাল পাত্র মিল্‌বে না, তখন কি কর্‌বেন ?”

“লীলার বিবাহ—লীলার বিবাহ।” দুই তিনবার এই কথা কয়েকটি বলিয়া লোকনাথ কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। তাঁহার

পর বলিলেন, "তবে নরেন বাবু, আপ্‌নি ওটাকা এখন রেখে দিন, লীলার বিবাহের সময় আমাকে ওটাকা দেবেন। এখন আপ্‌নার কাছেই জমা থাক্।"

অগত্যা সোমনাথ তাহাই স্বীকার করিলেন। তাহার পর লোকনাথ সোমনাথকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে লীলাকে সঙ্গে লইয়া গৃহে চলিয়া গেলেন। গৃহ হইতে বাহির হইয়াই লীলা সেই অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া গেল, কিন্তু সোমনাথ বাবু অনেকক্ষণ সেই অন্ধকারের দিকেই চাহিয়া রহিলেন। এবারেও নরেন্দ্রনাথ সোমনাথের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহার গণ্ডস্থলে অশ্রুজল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার পর আরো চারি বৎসর গত হইয়াছে। এখন লীলার বয়স দ্বাদশ বৎসর। এই বয়সেই প্রস্ফুটিতোন্মুখ গোলাপ কলিকাসদৃশ লীলার সে রূপের শোভা অঙ্গে যেন আর ধরে না। দেখিলেই মনে হয় এ ফুল ফুটিলে যে সৌন্দর্য্য বাড়িবে, সে সৌন্দর্য্য বুঝি আর এ অঙ্গে ধরিবে না। শৈশবের সে সৌন্দর্য্যের সহিত এখন এ সৌন্দর্য্যের আর তুলনা হয় না। বোধ হয় শৈশবের সৌন্দর্য্যের মধ্যে যৌবনের সৌন্দর্য্যরাশি প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত থাকে, তাহা না হইলে হঠাৎ এ সৌন্দর্য্যরাশি কোথা হইতে আসিবে? বালিকার এ উভয় সৌন্দর্য্যই

অতি সুন্দর ও অতি মনোহর। কিন্তু একথা যেন স্মরণ থাকে যে, লীলার যৌবনের সৌন্দর্য্যরাশির এখন আভাস মাত্র পাওয়া গিয়াছে।

কিন্তু এই আভাসেই আমরা কি বুঝিয়াছি? যাহা বুঝিয়াছি, তাহা বর্ণনায় প্রকাশ করা যায় না। প্রভাতে যে বালস্ূর্য্যের এত তেজ, মধ্যাহ্নে সে তেজ যে কত বাড়িবে, সেকথা অনুভব করা যায়, কিন্তু বর্ণনায় প্রকাশ করা যায় না। বর্ষার প্রারম্ভেই যে কল্লোলিনীর এত শোভা, পূর্ণবর্ষায় তাহার যে কত শোভা বাড়িবে, তাহা অনুভব করা যায়, কিন্তু বর্ণনায় শেষ করা যায় না। সে যাহা হউক, যখন এ সৌন্দর্য্যের এখনও কেহ আদর করিল না, তখন সে কথা লইয়া এখন আর বাড়াবাড়ি করিব না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, লোকনাথ কুলীন কায়স্থ। আজ কাল কায়স্থের কন্যার বিবাহ বড় সহজ কথা নহে, কন্যা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রূপবতী হইলেও কন্যাকর্ত্তা অর্থাভাবে মনোমত পাত্রে তাহার বিবাহ দিতে পারেন না। এখন সকল বিবাহেই প্রথম কন্যাকর্ত্তার ধনের পরীক্ষা; পরে কন্যার রূপের পরীক্ষা হইয়া থাকে। লীলা রূপবতী হইলে কি হইবে? লীলার পিতা অতি দরিদ্র বলিয়া কেহই সে রূপের আদর করিল না। লোকনাথ ক্রমে উদ্বিগ্ন হইলেন, বুঝি বা তাঁহার জাতি ও ধর্ম্ম রক্ষা করা ভার হয়। কায়স্থের ঘরে এমন অনেক কাঁলাচাঁদ বা নদের চাঁদ ছিল, যাহারা লীলাকে বিবাহ করিয়া লোকনাথকে অনুগৃহিত করিতে পারিত, কিন্তু সে সকল পাত্রে বিবাহ দিতে লোকনাথ স্বীকৃত নন। এ দিকে লীলাকেও এরূপ অবস্থায় আর রাখা যায় না। লোকনাথ

বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। রাত্রে তাঁহার আর নিদ্রা হয় না, আহারে তাহার আর প্রবৃত্তি নাই, গৃহকর্ম্মেও এখন আর তাঁহার কোন উৎসাহ নাই। কোন গুরুতর অপরাধ করিলে মনের অবস্থা যেরূপ হয়, এখন তাহার মনের অবস্থা সেইরূপ। যে স্নেহের কন্যাকে দেখিলে তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া যাইতেন, এখন সেই স্নেহের কন্যাও যেন তাঁহার চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লীলাকে দেখিলেই এখন তাঁহার প্রাণে একটা আতঙ্কের উদয় হইত, আবার পর মুহূর্ত্তেই কোথা হইতে যেন একটা প্রজ্বলিত হুতাশন তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিত, লোকনাথ অস্থির হইয়া পড়িতেন।

এত কালের পর বিন্দুবাসিনীরও সেই চিরপ্রফুল্ল মুখকমল এখন মলিন হইয়া গিয়াছে। সেই সততহাস্যময়ী মুখকমলে এখন আর সে হাসির শোভা দেখিতে পাওয়া যায় না। লোকনাথের অন্ধকারময় হৃদয় এখন আর সে হাসির আলোকে আলোকিত হয় না। তাহার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম লীলার আজও বিবাহ হইল না! এই দুর্ভাবনায় সে হাসির ফোয়ারা এখন একবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বিন্দুবাসিনীর আর এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখ, যে গৃহকর্ম্ম ছাড়া বিন্দু তিলার্দ্ধ থাকিতে পারিত না, এখন সে গৃহকর্ম্মেও আর তাহার মন নাই। তবে না রাঁধিলে চলিবে না তাই রাঁধিতে হয়, না খাইলে চলে না, তাই খাইতেও হয়। প্রথম প্রথম লীলার বিবাহের কথা উত্থাপন হইলে বিন্দুবাসিনীর আনন্দের সীমা থাকিত না, বিন্দু দিবাভাগে মনে মনে কত সুখের কল্পনা করিত, রাত্রে কত সুখস্বপ্নই দেখিত। বিন্দুবাসিনীর বড় সাধ, তিনি কন্যার বিবাহ দিয়া

একটির পরিবর্ত্তে দুইটি পাইবেন, জামাতাতেই পুত্রের সাধ মিটাইবেন। এখন মনোমত পাত্রে কন্যার বিবাহ দিতে না পারিয়া তাহার সেই সুখকল্পনা ও সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বিন্দু এই ঘটনায় প্রাণে যে আঘাত পাইয়াছে, এরূপ আঘাত জীবনে কখন পায় নাই।

লীলা এখন আর সেই ক্ষুদ্র বালিকা নয়, লীলার এখন জ্ঞান হইয়াছে। কিন্তু তত্রাচ লীলা তাহার জনকজননীর বিষাদের কারণ কিছু বুঝিতে পারিল না। সে ক্ষুদ্র বালিকা সমাজতত্ত্ব কিরূপে বুঝিবে? অনেক সময় লীলা ভাবিত—বালিকা বড় হয় কি কেবল পিতামাতাকে অসুখী করিবার জন্য? লীলা আর কি করিবে? কেবল গৃহধর্ম্মে মনোযোগ দিয়া পিতামাতাকে সুখী করিবার চেষ্টা করিত। দুর্ভাগ্যক্রমে লীলা বিনা অপরাধে পিতামাতার নিকট গুরুতর অপরাধী হইয়াছে, কিন্তু কি যে অপরাধ করিয়াছে লীলা তাহা বুঝিতে পারিত না।

এই ক্ষুদ্র পরিবারের যখন এইরূপ অবস্থা তখন একদিন বৈকালে বিন্দুবাসিনী চিন্তাকুল লোকনাথকে বলিল—"তোমার কি মনে হয় না, ওপাড়ার মেজঠাকরুণের ছেলে নরেনের কে বন্ধু না কি আমার লীলার বিয়ের জন্য সাড়ে বার গণ্ডা টাকা নরেনের কাছে রেখে দিয়েছে।"

লোকনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "সে টাকায় কি হবে? পঞ্চাশ টাকায় কি এখন মেয়ের বিয়ে হয়?"

বিন্দু। তবে কত টাকা হলে হয়?

লোক। যে বাজার পড়েছে, তাতে অন্তত পাঁচশ টাকার

কম, কোন মতেই এ দায় থেকে উদ্ধার হতে পারবো না।

বিন্দু। পাঁচ শ টাকা—পাঁচ শ টাকা—তাতে কত গণ্ডা হয়?

বিন্দুবাসিনীর কথা শুনিয়া এত দুঃখেতেও লোকনাথের মুখে হাসি দেখা দিল। ঈষৎ হাসিয়া লোকনাথ বলিল—"সে অনেক টাকা। আমাদের বাড়ীঘর জমাজমী বেচলেও তত টাকা হয় না।"

বিন্দু। তবে উপায়?

পুনরায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া লোকনাথ বলিল—"উপায় থাকৃলে কি আর এত দিন নিশ্চিন্ত থাকি?"

বিন্দু। যে বাবু না চাওয়াতেই আপ্‌নি জোর কোরে সাড়ে বার গণ্ডা টাকা লীলার বিয়ের জন্য রেখে গেছেন, তাঁর কাছে মুখ ফুটে চাইলে কি তিনি আরো কিছু বেশী দিবেন না?

লোকনাথ বসিয়াছিল, বিন্দুবাসিনীর শেষ কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া উঠিল। বিন্দু তাহাতে যেন কিছু ভীত হইয়া স্বামীর মুখের প্রতি চাহিল। লোকনাথ অমনি বলিয়া উঠিল—"বিন্দু—বিন্দু এতদিনের পর বুঝি অকুল সাগরের কুল পাইলাম। কত কষ্ট পেয়েছি—কিন্তু এ পর্য্যন্ত এখনও কারো কাছে ভিক্ষা করি নাই, শেষে লীলাকে সৎপাত্রে বিয়ে দিয়ে সুখী কর্‌বার জন্য একবার ভিক্ষা করেও দেখ্‌বো মনে মনে স্থির করে রেখে-ছিলাম। কিন্তু কার কাছে ভিক্ষা কর্‌তে যাই, তা এতদিন স্থির করতে পারি নাই। আজ তোমার কথায় সেই বাবুটির কথা মনে হয়ে গেল, বোধ হয় তাঁর কাছে ভিক্ষা কর্‌লে আমি এ

দায় হ'তে উদ্ধার হতে পার্‌বো। এখন আমি একবার নরেন-বাবুর কাছ থেকে সেই বাবুটির সন্ধান করে আসি।"

এই বলিয়া লোকনাথ আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া তাড়াতাড়ি নরেন্দ্র বাবুর বাড়ী চলিল। নরেন্দ্রনাথ তখন বৈঠকখানায় একাকী ছিলেন। লোকনাথ সজলনয়নে আপনার অবস্থার বিষয় সমস্ত কথা প্রকাশ করিল, এবং নরেন্দ্রবাবুর চরণে ধরিয়া বলিল—"আপনার সেই বন্ধু ভিন্ন এ দায় থেকে উদ্ধার হবার আমার আর অন্য উপায় নাই। আপ্‌নাকে এ বিষয়ে আমায় সাহায্য করতে হবে।"

নরেন্দ্রবাবু লোকনাথকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—"আপনি এত দিন আমায় এ কথা বলেন নাই কেন? সোমনাথ বাবু আপনার লীলাকে যেরূপ স্নেহ করেন, তাতে তিনি যে আপনাকে এ দায় থেকে উদ্ধার করে দেবেন, এ বিষয়ে আমার বিশেষ ভরসা আছে। তিনি আমায় যে সকল পত্র লেখেন, তার প্রতি পত্রেই লীলার কথা থাকে। লীলা কেমন আছে—সে কত বড় হয়েছে—তার বিয়ে হয়েছে কি না—এইরূপ কথা তাঁর প্রতি পত্রেই দেখ্‌তে পাই। এখন তিনি কলকেতাতেই আছেন, আমি আজি তাঁকে এ বিষয়ের জন্য পত্র লিখ্‌বো।"

নরেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া লোকনাথের আর আনন্দের সীমা রহিল না। আনন্দাশ্রু তাহার গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। লোকনাথ আনন্দে বিহ্বল হইয়া বলিল—"তবে কি আমি এ দায় থেকে উদ্ধার হতে পারবো—আমার লীলাকে কি আমি সুখী করতে পারবো? সে বাবুটি আমার

আত্মীয় স্বজন কেউ নয়। তাঁর কি আমার লীলার প্রতি এত দয়া হবে?"

নরেন্দ্রনাথ বলিলেন—"ঘোষজা মহাশয়, আপনার ন্যায় নির্ব্বিরোধী লোক এ গ্রামে আর দুটি নাই, আপনার কোন উপকার করবার জন্য আমি প্রাণপণে চেষ্টা করবো, যদি সোমনাথ বাবু সমস্ত ব্যয় না দেন, আমি আমার অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুর নিকট চাঁদা করে সে ব্যয় নির্ব্বাহ করবো। আজ হতে লীলার বিবাহের ভার আমার, আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন গে।"

লোকনাথ যেন স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইল, কিন্তু সেখানে আর অধিকক্ষণ থাকিতে পারিল না, এ সংবাদ বিন্দুবাসিনীকে দিবার জন্য দৌড়িয়া গৃহে আসিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"ঘোষজা মহাশয় বাড়ী আছেন—ঘোষজা মহাশয়?"

তিন দিবস পরে চতুর্থ দিনের প্রাতঃকালে নরেন্দ্রনাথ লোকনাথের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছিলেন—"ঘোষজা মহাশয় বাড়ী আছেন—ঘোষজা মহাশয়?"

নরেন্দ্রনাথ একাকী নহেন, তাঁহার সঙ্গে আমাদের সেই পূর্ব্ব পরিচিত সোমনাথ বাবুও ছিলেন। লোকনাথ তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া উভয়কে দেখিয়া প্রথমে কিছুক্ষণ যেন হতবুদ্ধি হইয়া রহিল, তাহার পর পরমাহ্লাদে তাহাদিগকে বাড়ীর মধ্যে বিশেষ সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিল। লোকনাথ গৃহের মধ্যস্থিত শয্যা তাড়াতাড়ি ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া একখানি

মাহুর আনিয়া উভয়কে দাওয়াতে বসিতে দিল। সোমনাথ বাবু তাহাকে এরূপ ব্যস্ত হইতে নিষেধ করিয়া নরেন্দ্রনাথের সহিত সেই মাহুরে উপবেশন করিলেন। এবার নরেন্দ্রবাবু বলিলেন—"তোমার লীলার অদৃষ্ট বড় সুপ্রসন্ন, সোমনাথ আমার পত্র পেয়ে, সে পত্রের উত্তরে পত্র না লিখে, নিজেই বল্‌তে এসেছেন যে, তিনি তোমার লীলার বিবাহের সমস্ত খরচ দিবেন, তোমাকে তার জন্য কোন চিন্তা কর্‌তে হবে না।"

নরেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া লোকনাথ একবারে কাঁদিয়া ফেলিল, কিরূপে সোমনাথ বাবুকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইবে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। আমরা জানি লোকনাথ এই সময় বাক্য দ্বারা তাহার কিছুই প্রকাশ করিতে পারে নাই। তবে যদি চক্ষের জলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয়, তবে লোকনাথ সে বিষয়ে কোন ত্রুটি করে নাই। নরেন্দ্রনাথ ও সোমনাথ হঠাৎ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলে বিন্দুবাসিনী নরেন্দ্রনাথের সহিত একজন অপরিচিত ব্যক্তি দেখিয়া প্রথমে তাড়াতাড়ি গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এখন নরেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া তিনি আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন, সুতরাং আর গৃহের মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তাহাদের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—"কে বাবা তুমি?—আমার লীলার উপর তোমার এত দয়া,—কে বাবা তুমি?"

সোমনাথ দেখিলেন গৃহিণীর চক্ষে ও অবিরল অশ্রুধারা নির্গত হইতেছে, সোমনাথ সে দৃশ্য দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন না! এইবার তাঁহারও চক্ষু অশ্রুজল ভারাক্রান্ত হইল, তিনি কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—"মা, আমি তোমার ছেলে।"

এই সময় কতকগুলি মাজা বাসন লইয়া অতি ধীরে ধীরে লীলা প্রাঙ্গণের মধ্যে আসিল, আগন্তুক দুই জনকে দেখিয়া লজ্জায় একটু জড়সড় হইল। তাহা দেখিয়া বিন্দুবাসিনী বলিল—"লজ্জা কি মা, অপর কেউ নয়, এঁরা তোমার ভাই।"

লীলা তখন আর লজ্জা করিল না, নতশীরে ধীরে ধীরে মাজা বাসনগুলি রাখিতে গৃহের মধ্যে গেল, ঘরের মেজের উপর বাসনগুলি রাখিয়া পুনরায় বাহিরে চলিয়া আসিল। দাওয়া দিয়া চলিয়া যাইবার সময় গোপনে ঈষৎ বক্রনয়নে সোমনাথ বাবুর প্রতি লীলা এক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, কিন্তু লীলার সে দৃষ্টি গোপন রহিল না, অন্য কেহ জানিতে না পারিলেও সোমনাথ বাবু তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, কারণ সেই সময় তিনিও সেইরূপ গোপনে লীলাকে দেখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। উভয়ের সেই বক্রদৃষ্টি এক সমসূত্রে মিশিল, সুতরাং উভয়ে কেবল উভয়ের নিকট ধরা পড়িল। সোমনাথ বাবুর হৃদয় কি জানি কেন এই সময় একবার কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার মস্তক যেন ঘুরিয়া গেল, অনেক চেষ্টার পর তিনি একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন। লীলা কিন্তু ধরা পড়িয়া সলজ্জভাবে সে স্থান হইতে চলিয়া গিয়া উঠান ঝাট দিতে নিযুক্ত হইল, আর একবারও সোমনাথ বাবুকে দেখিবার চেষ্টা করিল না! লীলা সেই ঈষৎ বক্র দৃষ্টিতেই সোমনাথকে চিনিতে পারিয়াছিল, কারণ সে রূপ একবার দেখিলে কেহ কখন ভুলিতে পারে না।

লীলা লজ্জাপ্রযুক্ত সোমনাথ বাবুর প্রতি আর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল না বটে, কিন্তু ইহাতে সোমনাথ বাবুর বড়ই সুবিধা হইল, তিনি সকলের অজ্ঞাতে বারবার লীলাকে দেখিতে লাগিলেন।

কিন্তু সে রূপ যত দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার দর্শনপিপাসা বৃদ্ধি বই হ্রাস হয় নাই! এই সময় নরেন্দ্রবাবু লীলার বিবাহে কিরূপ ব্যয় হইবে, কিরূপ পাত্র হইলে ভাল হয়, লোকনাথ ও বিন্দুবাসিনীর সহিত এই সকল বিষয় পরামর্শ করিতেছিলেন, সোমনাথ* বাবু বাহিক আকারে প্রকাশ করিতেছিলেন, যেন তিনি একমনে এই সকল কথাই শুনিতেছেন, কিন্তু আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, এ সময় যে সকল কথা হইতেছিল, তাহার একটি কথাও তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। তিনি তখন ভাবিতেছিলেন লীলার ওই সুন্দর মুখখানি দেখিতে দেখিতে কিসে এত আরক্তিম হইল? লজ্জায় না গুরুতর পরিশ্রমে এরূপ হইল, তিনি এখন ইহারই মীমাংসায় ব্যস্ত। এই সময় নরেন্দ্রনাথের কথা শেষ হইল, নরেন্দ্রনাথ সোমনাথকে বলিলেন, "তবে এখন চল যাই, যেরূপ কথাবার্ত্তা হল, সেইরূপই করা যাবে।"

কথাবার্ত্তা যে কি হইল, তাহা ত সোমনাথ বাবু জানেন না, কিন্তু এখন এস্থান হইতে উঠিয়া চলিয়া যাইবারও তাঁহার ক্ষমতা ছিল না, কারণ এই সময় লীলাময়ী আবর্জ্জনাদি ফেলিতে বাহিরে গিয়াছিল, যাইবার সময় একবার সেই আরক্তিম সুন্দর ঢল ঢল মুখখানি না দেখিয়া কি সোমনাথ বাবু যাইতে পারেন? কিছুক্ষণ আরো অপেক্ষা করিবার জন্য সোমনাথ বাবু বলিলেন—"তবে বিবাহ কি এই মাসেই হবে?"

নরেন্দ্রবাবু বলিলেন—"সে কথা ত এইমাত্র হয়ে গেল, পাত্র স্থির হলেই হবে।"

লোকনাথ বলিল—"বাবা আজ যদি পাত্র স্থির হয়, আমি

কাল বিয়ে দেবো, এ মেয়ে কি বাবা, আর আমি ঘরে রাখ্‌তে পারি ?”

বিন্দুবাসিনী বলিল—“বাবা, তুমি রাজা হও, তোমার সোণার দোয়াত কলম হ’ক, আর আমার মাথায় যত চুল তোমার তত পেরমাই হ’ক।”

বিন্দুবাসিনীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া সোমনাথ নতশিরে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, এই সময় লীলা বাহির হইতে ফিরিয়া আসিল, সোমনাথ লীলাকে দেখিতে দেখিতে নরেন্দ্রনাথের সহিত লোকনাথের গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

অনেকক্ষণ উভয়ে নীরবে চলিলেন। নরেন্দ্রনাথ কি ভাবিতেছিলেন, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু সোমনাথ যে লীলার সেই আরক্তিম মুখের সৌন্দর্য্যের বিষয় ভাবিতেছিলেন, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। নরেন্দ্রনাথ বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইলে হঠাৎ তাঁহার সোমনাথের প্রতি দৃষ্টি পড়িল, তিনি তাঁহাকে কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন দেখিয়া বলিলেন —“ভাই সোমনাথ, তুমি কি ভাবিতেছ ?”

সোমনাথ একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন—“আমি সমাজের অত্যাচারের কথা ভাব্‌ছি।”

নরে। কি অত্যাচার ভাই ?

সোম। দরিদ্রের কন্যা পরমাসুন্দরী হলেও এসমাজে তাহার পাত্র মেলে না! যার অর্থ দেবার কোন সামর্থ নাই, তবে কি তার কন্যার বিবাহ হবে না ? এর চেয়ে বেশী অত্যাচার আর কি হতে পারে ?

নরে। এখন ক্রমে যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, তাতে উপযুক্ত

খরচপত্র না করতে পারলে কন্যার বিবাহ হওয়া দায়। আমাদের এই গ্রামেই নবীনবোসের এক পুত্র আছে, দেখতে অতি কদাকার, কিন্তু গুণের মধ্যে ছেলেটি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সেই ছেলের সঙ্গেই লোকনাথ তাহার কন্যার বিবাহের জন্য চেষ্টা করতে আমায় বিশেষ অনুরোধ করেছে, কিন্তু আমি বেশ বলছি—দুটি হাজার টাকার কম নবীন বাবু কোন মতে রাজী হবেন না। এই যে নবীন বাবু এই দিকে আসছেন, একটু অপেক্ষা কর না, একবার জিজ্ঞাসা করে দেখি।

এই সময় সেই গ্রামের নবীনচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্যান্য কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর নরেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"নবীনবাবু, আপনাব পুত্রের জন্য আমি একটি সম্বন্ধ স্থির করেছি, সে বিষয়ে আপনার কি মত বলুন।"

নবীনবাবু একটু মুচকিয়া হাসিয়া উত্তর করিলেন—"ছেলেটি আমার সবে এণ্ট্রান্স পাস করেছে, এ সময় বিবাহ দিলে ২। ৩ হাজারের বেশীত আর পাব না, এল এ পাশটা করতে পারলে কিছু বেশী রকম পাওয়া যেতে পারে, তাই আমার ইচ্ছে—"

নরে। তবে কি আপনি এখন পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক নয়।

নবী। আমি ইচ্ছুক নই বটে, কিন্তু গৃহিনীর একটি পুত্রবধূর বড়ই সাধ হয়েছে, তাই মনে করছি প্রথম ছেলেটি আর অধিক দিন ধরে না রেখে এই সময়ই বিবাহটা দিয়ে ফেলি। তা সম্বন্ধটা কোথায়—কি রকম পাওনা টাওনা হবে বল দেখি ?

নরে। পাওনা বেশী আর কোথা থেকে হবে, আমি

আমাদের গ্রামের লোকনাথ ঘোষের কন্যার সঙ্গে যে সম্বন্ধ কর্‌ছি।

নবীন বাবু নরেন্দ্র নাথের কথা শুনিয়া উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন—"তবে তুমি ঠাট্টা করছো বল।"

নরে। কেন ঠাট্টা কিসে হলো? লোকনাথ আপনাদের স্বজাতি ও স্বঘর। আর কন্যাটিও পরমাসুন্দরী, তবে ঠাট্টা কিসে হলো?

নবী। স্বজাতি, স্বঘর আর মেয়ে সুন্দর হলেই কি আজ কাল বিবাহ হয়? বল্লভপুরের মুন্সেফ দুহাজার টাকা দিতে চেয়ে ছিলো, তারই মেয়ের সঙ্গে যার আমি উপেনের বিবাহের মত করিনি।

নরে। আচ্ছা, যদি লোকনাথ দুহাজার টাকা দেয়, তবে আপনি রাজী আছেন।

নবী। কোথায় পাবে তা দেবে। যে খেতে পায় না, সে আবার দুহাজার টাকা মেয়ের বিবাহে খরচ করবে, এ কথা বিশ্বাস হবে কেন?

নরে। দেখুন লোকনাথ গরীব বলে, কোন ভদ্রলোক তার কন্যার বিবাহের সমস্ত ব্যয় দিবেন। তিনি দুহাজার টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করতে পারেন, আর লোকনাথেরও একান্ত ইচ্ছা যে আপনারই পুত্রের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দেয়। দেখুন, এতে আপনি রাজী আছেন কি?

নবী। আমার ছেলের মতন ছেলে পাবে কোথায়? কিন্তু আমি তোমার এ সম্বন্ধে রাজী হতে পারি না। এখন যেন এক জন ভদ্রলোক দয়া করে সমস্ত খরচ দিচ্ছেন, তাই আমায় দুহা-

জার টাকা দিলে, কিন্তু এ যে আমার মূলোর ক্ষেত হবে।

নরে। মূলোর ক্ষেত কি বলুন।

নবী। বিবাহের সময় যা কিছু পেলাম ঐ পর্য্যন্ত, তার পর আর কুটুম্বিতের সুখ হবে না।

নরে। কুটুম্বিতের সুখ হবে না কেন, লোকনাথ গরীব হ'ক—কিন্তু লোক অসজ্জন নয়।

নবী। হিন্দুরঘরে বার মাসে তের পার্ব্বণ আছে, সে সকল পার্ব্বণে রীতিমত তত্ত্ব করতে পার্ব্বে কেন?

নরে। আত্মীয়তা রক্ষা করবার জন্য যেরূপ তত্ত্ব লওয়া আবশ্যক, তা তিনি বেশ পার্‌বেন, তবে প্রতি পার্ব্বণে বড় বড় হাঁড়ি করে তত্ত্ব পাঠাতে পার্‌বেন না বটে।

নবী। তবেইত—তবেইত—কুটুম্বিতের সুখ আর কি করে হবে? তারত হাঁড়ির খপর আমি জানি।

নরে। তবে আপনি রাজী নন?

নবীনবাবু ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতিসূচক উত্তর দিয়া আপনার গন্তব্য পথে চলিলেন। সোমনাথ বাবু এতক্ষণ নীরবে উভয়ের সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন, এইবার নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই নবীন বাবুর সম্পত্তি কি আছে?"

নরে। সম্পত্তির মধ্যে চাকরী আর বাস্তু ভিটে।

সোম। কি চাকরী করেন?

নরে। কলিকাতায় কোন স্কুলে ৩০ ত্রিশ টাকা বেতনের মাষ্টারী, আর মধ্যে মধ্যে সভা করে লম্বা লম্বা বক্তৃতা।

সোম। ইনি তবে একজন 'ভারত উদ্ধারের দলের' লোক। এরাই আবার ভারতের সামাজিক আর রাজনৈতিক সংস্কার করে ভারত উদ্ধার করবেন! যাঁরা নিজের সমাজের সংস্কার করা দূরে থাকুক, সমাজের মধ্যে নানা প্রকার কুপ্রথা প্রবেশ করিয়ে সমাজকে উচ্ছন্ন দিচ্ছেন, তাঁরাই আমাদের দেশের সংস্কারক।

নরে। এদের সমাজ সংস্কার কি রকম জান্‌বেন—অবলা হিন্দু-বিধবার বিবাহ দেওয়া—স্ত্রীপুরুষকে সমান অধিকার দেওয়া আর ইংরেজ তাড়িয়ে দিয়ে স্বাধীন হওয়া। সকল অনুষ্ঠানই কেবল মুখে, কাজে কিছুই হবে না। কল্‌কেতায় বসুজার বক্তৃতা শুন্‌লে, বসুজাকে ব্রাহ্ম বলে মনে হবে, বাপের শ্রাদ্ধ উপলক্ষেও ব্রাহ্ম হন, কিন্তু ছেলের বিবাহের কথা উত্থাপন করলে ইনি একজন গোঁড়া হিন্দু হয়ে দাঁড়ান। সে যা হক, লোকনাথের কন্যার বিবাহের পাত্র স্থির করা প্রথমে যত সহজ মনে করেছিলাম, এখন দেখ্‌ছি এ কাজ তত সহজ নয়। আমি দেখ্‌ছি পিতা গরীব হলে উপযুক্ত অর্থ ব্যয় কর্‌লেও যে সুপাত্র মেলে না! লীলার কি তবে পাত্র মিল্‌বে না?

নরেন্দ্রনাথের শেষ কথা শুনিয়া সোমনাথ চম্‌কিয়া উঠিলেন। হঠাৎ সম্মুখে বজ্রাঘাত হইলে লোকে যেরূপ চম্‌কিয়া উঠে, সোমনাথ সেইরূপ চম্‌কিয়া উঠিলেন। তাহার পর উত্তেজিত ভাবে ও উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"লীলার পাত্র মিল্‌বে না! এ পৃথিবীতে এমন কি কেউ নাই যে লীলাকে পেলে আপনার জীবন সার্থক মনে করে—অসম্ভব। এত সৌন্দর্য্যও গুণের আদর হবে না! অসম্ভব—অসম্ভব!!"

নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ সোমনাথের এরূপ উত্তেজিত ভাব দেখিয়া ও কথা শুনিয়া প্রথমে থতমত খাইয়া গেলেন। তাহার পর বলিলেন—"কই এমন লোক কোথায়?"

সোমনাথ সেইরূপ উত্তেজিত ভাবে ও গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"আমি!"

নরেন্দ্রনাথ অবাক্! এরূপ অসম্ভব কি কখন সম্ভব হইতে পারে? প্রথমে আপনার কর্ণকেই অবিশ্বাস করিয়া বলিলেন—"কে?"

পুনরায় উত্তর আসিল—"আমি।"

আবার সেই আমি! নরেন্দ্রনাথ আবার অবাক্! এবার কাহাকে অবিশ্বাস করিবেন? নরেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ সোমনাথের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—"এ কথা কি সত্য না উপহাস?"

সোমনাথ এক অস্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর করিলেন—"রাস্তায় এ সকল কথা আর হতে পারে না, চল ঘরে চল। তোমায় সকল কথা খুলে বলবো।"

নরেন্দ্রনাথ আর একটিও কথা কহিলেন না, উভয়ে গৃহে প্রবেশ করিলেন। সোমনাথের সেই স্বরবৈলক্ষণ্যের কারণ নিরূপণ করিবার জন্য এই সময় নরেন্দ্রনাথ একবার সোমনাথের মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু কি দেখিলেন? আবার কি দেখিবেন—সেই অশ্রুজল!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মনুষ্য চরিত্র সহজেই বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু অপরকে বুঝাইতে পারা বড় সহজ নহে। সোমনাথ বাবুর চরিত্র আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু পাঠকপাঠিকাগণকে তাহা বুঝাইতে পারিয়াছি কি না তাহা আমরা জানি না। সকলেই বুঝিয়াছেন যে সোমনাথ সচ্চরিত্র, দয়ালু, বিদ্বান ও অন্যান্য অনেক গুণে ভূষিত। কিন্তু ইহা ব্যতীত এই চরিত্রে যে আরো একটু বিশেষত্ব আছে, তাহা সকলে বুঝিয়াছেন বলিয়া এখনও আমাদের ভরসা হয় নাই। যতক্ষণ সে বিশেষত্বটুকু বুঝাইতে না পারিব, ততক্ষণ আমরা পাঠকপাঠিকাগণকে বিরক্ত করিতে ছাড়িব না।

সোমনাথ প্রথমে আমাদের লীলাময়ীকে সেই জলঝড়ের মধ্যে যে অবস্থায় দেখেন, সে অবস্থায় দেখিয়া তাঁহার মনে যে লীলার প্রতি দয়ার উদ্রেক হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? সেই সময় তিনি লীলাময়ীর রূপ দেখিয়া বিস্মিত হন, তাহার পর তাহার অসাধারণ গুণের পরিচয় পাইয়া, একবারে মোহিত হইয়া যান। এত দরিদ্র তবুও দান গ্রহণ করে না, এত দরিদ্র তবুও জিনিষ বিক্রয় করিতে গিয়া খরিদারের যাচিত মূল্য অধিক বোধে তাহা প্রত্যর্পণ করে! এই ক্ষুদ্র বালিকার এ সকল গুণ কি অসাধারণ নয়? সোমনাথের ন্যায় হৃদয়বান্ ব্যক্তির সহানুভূতি কি ইহাতে শীঘ্রই আকর্ষিত হইতে পারে না? এই এক ঘটনাতেই লীলাময়ীর

প্রতি সোমনাথের বিশেষ সহানুভূতি হইল। সেই দিনকার এই ঘটনাতেই এই ক্ষুদ্র বালিকা সোমনাথের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিল। এই চারি বৎসরের মধ্যে আর একবারও লীলাকে না দেখিলেও সোমনাথ লীলাময়ীকে সেই হইতে আর ভুলিতে পারেন নাই। তিনি অনেক সময় লীলার বিষয় ভাবিতেন। নরেন্দ্রনাথ স্পষ্ট বলিয়াছেন যে,সোমনাথ তাঁহাকে যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, তাহার প্রতি পত্রেই লীলাময়ীর সংবাদ লইয়াছেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে লীলা সোমনাথের হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিল। এখন সেই লীলার বিবাহ হয় না, দরিদ্র কন্যা বলিয়া কেহ তাহাকে বিবাহ করিতে চায় না, এই সকল কথা যখন নরেন্দ্রনাথের পত্রে তিনি জানিতে পারিলেন, তখন কি আর তিনি স্থির থাকিতে পারেন? নরেন্দ্রনাথের পত্রে অবশ্য সোমনাথের নিকট মাত্র অর্থ সাহার্য্যের প্রার্থনা ছিল; কিন্তু এই চারি বৎসরে সেই ক্ষুদ্র লীলা সোমনাথের মনের এতদুর পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইয়াছিল যে, সোমনাথ নরেন্দ্রনাথের পত্র পাইয়া স্বয়ং আসিয়া বিজয় নগরে উপস্থিত হইলেন। এই ঘটনায়ও নরেন্দ্রনাথের কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই, তিনি তখন মনে করিলেন, সোমনাথ বুঝি তাঁহারই বন্ধুত্বের টানেই স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বিজয়নগরে আসিয়া লীলাকে দেখিবার ইচ্ছা তাঁহার এতদুর প্রবল হইয়াছিল যে, আর দেরী সহ্য হইল না। সোমনাথ বেড়াইতে যাইবার ছল করিয়া নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বয়ংই লোকনাথের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লোকনাথকে ডাকিয়া না পাঠাইয়া কেন যে সোমনাথ স্বয়ং তাহার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত

হইলেন, নরেন্দ্র সে সময় সঙ্গে থাকিয়াও সে কথা বুঝিতে পারেন নাই। তাহার পর সোমনাথের নীরবে অন্যমনে অবস্থান, তাঁহার সেখান হইতে ফিরিয়া চলিয়া আসিবার সময় একটু ইতস্ততঃ ভাব, এ সকল কি আর নরেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারেন?

কেন যে সোমনাথ একজন প্রাণের বন্ধুর নিকট তাঁহার হৃদয়নিহিত প্রণয় প্রকাশ করিয়া বলিতে পারেন নাই, এ রহস্য ভেদ করিতে আমরা অক্ষম, তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, সোমনাথ বন্ধুর নিকট সে কথা প্রকাশ করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সক্ষম হন নাই। তাহার পর সেখান হইতে ফিরিয়া আসিতে আসিতে সোমনাথ রাস্তায় নবীন বাবুর ব্যবহার স্বচক্ষে দেখিয়া এতদূর উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন যে, তিনি তাঁহার সেই হৃদয়পোষিত মনের ভাব বন্ধুর নিকট হঠাৎ প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন; সুতরাং এই উত্তেজনায় তিনি পূর্ব্বের বাধা অনায়াসে অতিক্রম করিতে সক্ষম হইলেন।

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া উভয়ে বৈঠকখানার দিকে চলিলেন, সে গৃহে কাহাকে আসিতে নিষেধ করিয়া সোমনাথ দরজা অর্গলাবদ্ধ করিলেন। হৃদয়ের কপাট খুলিবেন কি না, সেই কারণ ঘরের কপাট দৃঢ়রূপে বন্ধ করা হইল। সোমনাথকে প্রথমে কোন কথাই বলিতে হইল না, নরেন্দ্রনাথই প্রথম আরম্ভ করিলেন—"সোমনাথ, যদি তোমার কথা সত্য হয়, তবে তুমি মানুষ নও—তুমি দেবতা।"

সোমনাথ ঈষৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"তুমি দেবতার অবমাননা কর কেন?"

নরে। যে পথের ভিখারিণীকে রাজরাণী কর্‌তে পারে, তাকে দেবতা বলবো না ত কি বল্‌বো ?

সোম। ওকথা এখন থাক্। দেখ নরেন, আমার পিতা মাতা কেউ নাই। বিবাহ সম্বন্ধে আর কারো অনুমতি চাই না, কিন্তু চাই কেবল তোমার। তুমি এ বিবাহ অনুমোদন কর কি না ?

নরে। আমি ত তোমায় বলেছি, তুমি এ বিবাহ কর্‌লে তোমায় আর মানুষ ভাব্‌বো না, দেবতা বলে ভক্তি কর্‌বো। এতে সমাজকেও বিলক্ষণ শিক্ষা দেওয়া হবে, আর এ কথা যে শুন্‌বে সেই তোমায় দেবতার ন্যায় ভক্তি কর্‌বে।

সোম। তোমার এখানে দুই তিনবার এসেছি, কিন্তু এখানকার কেউ যখন আমার প্রকৃত পরিচয় জানে না, তখন এখানে আর কোন পরিচয় দেবার আবশ্যক করে না। তবে আমি যে জাতিতে কায়স্থ, একথা লোকনাথকে তুমি বলো আর আমার কুলশীলের পক্ষে যাতে কোন সন্দেহ না হয়, তার জন্য জামীন হইও—অন্য কোন পরিচয় আর দেবার আবশ্যক করে না।

নরে। আচ্ছা সে বেশ কথা। তোমার পরিচয় দিলে হয়ত এখন হঠাৎ কেউ বিশ্বাসই কর্‌বে না।

এইবার সোমনাথের মন প্রফুল্ল হইল। একখানা কাল মেঘ অনেকক্ষণ পূর্ণিমার চন্দ্রকে ঢাকিয়া রাখিয়া হঠাৎ সরিয়া গেলে সে চন্দ্রের যেরূপ শোভা হয়, সোমনাথের মুখচন্দ্রও সেইরূপ শোভা ধারণ করিল। সোমনাথ তখন সহাস্যমুখে কি কথা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু আবার একটু লজ্জিতভাবে যেন ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ এতদিন যেন

অন্ধ ছিলেন, এইবার কিন্তু তাঁহার চক্ষু ফুটিয়াছে। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"এখনি কি আমার লোকনাথের বাড়ী দৌড়িয়ে যেতে হবে না কি? না তুমিও আমার সঙ্গে যাবে?"

সোম। নাহে না, সে কথা নয়।

নরে। তবে আর কি কথা? আমি বেশ বল্‌ছি যে লীলা ছাড়া এখন তোমার আর কোন কথাই নাই। লীলার সম্বন্ধে তোমার লীলাখেলা এখন আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তুমি আচ্ছা আমার চক্ষে ধূলো দিয়েছিলে, পূর্ব্বে আমার মনে একটু সন্দেহ পর্য্যন্ত হয় নাই!

সোমনাথ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"লীলার কথাই বটে, কিন্তু তুমি যা ভেবেছ তা নয়, আমি বল্‌ছিলাম কি লীলার সঙ্গে কি আমার একবার গোপনে দেখা হ'তে পারে না?"

নরেন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তবে কি এখনি কোর্টসিপের বন্দোবস্ত কর্‌তে যাব না কি?"

সোমনাথ উত্তর করিলেন—"না ভাই, অপরাধ হয়েছে, তোমায় কোন বন্দোবস্তই আর কর্‌তে হবে না।" নরেন্দ্রনাথ কিন্তু তত্রাচ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সোমনাথ তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"কোথায় যাও?"

নরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন—"আবার কোথায়?—তোমার লীলার কাছে।"

সোম। এখনি—এত তাড়াতাড়ি যাবার কি দরকার?

"এত বড় একটা শুভসংবাদ তাদের না জানিয়ে কি আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাক্‌তে পারি?"—এই কথা বলিয়া নরেন্দ্রনাথ

ব্যস্ততার সহিত গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। সোমনাথ অনেক-ক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গ্রামে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। লোকনাথ অতি দরিদ্র, তাহার কন্যার যদি সুপাত্রে বিবাহ হয়, তবে যে হিন্দু ধর্ম্মই মিথ্যা হইয়া যাইবে! সোমনাথকে গ্রামের অনেকেই দেখিয়াছিলেন, গ্রামের অনেকেই জানিতেন যে, নরেন্দ্রনাথের বন্ধু সোমনাথ দেখিতে অতি সুশ্রী, সচ্চরিত্র, বিদ্বান আর সঙ্গতিপন্ন। সুতরাং এরূপ পাত্রের সহিত দরিদ্র লোকনাথের কন্যার বিবাহ হইবে—একথা শুনিয়া কি আর তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? পাড়ায় পাড়ায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয় দলের মধ্যেই একটা তুমুল আন্দোলন উঠিল। ক্রমে লোকনাথ ও বিন্দুবাসিনী সে সকল কথা শুনিল, তখন তাহাদের আনন্দসাগরে পুনরায় বিষাদের তরঙ্গ উঠিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে বিন্দুবাসিনী লোকনাথকে বলিল—"তুমি অত ভাব কেন—যার এমন স্বভাব—এত দয়া সে কি কখন লোকের জাত নষ্ট করতে পারে? দেখ্ছ না—আমাদের ভাল কেউ দেখ্তে পারে না বলে হিংসে করে নানান লোকে নানান কথা তুলছে।"

লোকনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"তাত জানি, কিন্তু সোমনাথকেও তার পরিচয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলে সোমনাথও কোন পরিচয় দেয় না। সে কথা জিজ্ঞেস্ করলেই যেন বিরক্ত হয়, অম্‌নি কথাটা চাপা দিয়ে অন্য কথা পাড়ে।"

বিন্দু। সে যে কায়স্থ সে পরিচয় ত দিয়েছে, তাহার পর আজ কালের ছেলে আবার পরিচয় কি দেবে? আহা ছেলে মানুষ! অভিভাবক কেউ নেই। আপ্‌নি দেখে শুনে বিয়ে কর্‌ছে—এত পরিচয় দিয়ে বিয়ে কর্‌তে লজ্জা করে বোধ হয়।

লীলাময়ী এইখানে বসিয়া লক্ষ্মীপূজার ধান বাচিতে ছিল, লোকনাথ এইবার আমোদ করিয়া লীলাকে জিজ্ঞাসা করিল—"মা, তোমার কি মত?"

লীলা লজ্জায় জড়সড় হইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। লোকনাথ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—"দেখ বিন্দু, সোমনাথ ছেলে ভাল বটে, কিন্তু যখন এত কথা উঠ্‌ছে, তখন সোমনাথকে মেয়ে না দেওয়াই ভাল। কোন দোষই যদি না থাক্‌বে, তবে এমন ভাল ছেলে এত বয়স পর্য্যন্ত বিয়ে হয় নাই কেন?"

বিন্দুবাসিনী উত্তর করিল—"আজ কালের ছেলেরা কি অল্প বয়সে বিয়ে করে?"

লোকনাথ পুনরায় চিন্তা করিয়া বলিল—"না, আমি এ বিবাহ দেব না।"

এই সময় বিন্দুবাসিনী একবার লীলার প্রতি চাহিয়া দেখিল, লীলা হেঁট হইয়া ধান বাচিতেছিল, আর বিশেষ উৎসুকের সহিত কাণ পাতিয়া পিতামাতার সমস্ত কথা শুনিতেছিল। বিন্দুবাসিনী বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া দেখে যে, কোথা হইতে টপ্ টপ্ জল পড়িয়া লীলার ক্রোড়স্থিত লক্ষ্মীপূজার বাচা ধানগুলি ভিজিতেছে। তৎক্ষণাৎ বিন্দুবাসিনীর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, এ জল আর কোথা হইতে আসিবে—এ জল লীলারই অশ্রু-

জল! তবে কি লীলা কাঁদিতেছে! পিতা সোমনাথের সহিত বিবাহ দিতে অনিচ্ছুক বলিয়া কি লীলা কাঁদিতেছে!! মুহূর্ত্ত-মধ্যে এই কথা বিন্দুবাসিনীর মনে জাগিয়া উঠিল। বিন্দুবাসিনী লোকনাথকে ডাকিয়া বলিল—"দেখ—তোমার মায়ের যে কি মত তা ঐ চক্ষের জলেই প্রকাশ পাচ্ছে।"

জননীর কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ লীলাময়ী সেখান হইতে দৌড়াইয়া গিয়া একবারে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ঘরের মধ্যে গিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তাহা দেখিয়া লোকনাথ একবারে যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল। লোকনাথ জানিত আজও তাহার লীলা বালিকা, তবে কি বালিকার হৃদয়ে ইহারই মধ্যে প্রণয় অঙ্কুরিত হইয়াছে! এখন লীলা আর পূর্ব্বের ন্যায় পিতার নিকটে সর্ব্বদা থাকিত না, পিতা আদর করিলে লজ্জায় যেন জড়সড় হইয়া যাইত। পূর্ব্বে লীলা পিতার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিত, কিন্তু এখন আর লীলা পিতার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিত না, লোকনাথ অনেক সময় ভাবিত যে, এখন লীলা কেন এরূপ করে? আজ মুহূর্ত্তের জন্য লোকনাথ যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতেই তাহার সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া গেল। সেই জন্য লোকনাথ এখন হতবুদ্ধি হইয়া রহিয়াছে। লীলার বালিকাজীবনের এখন তবে পরিবর্ত্তন হইয়াছে—লোকনাথ অবাক্ হইয়া কেবল এই কথাই ভাবিতে লাগিল।

লীলার এ পরিবর্ত্তনে কিন্তু বিন্দুবাসিনী এতদূর বিস্মিত হয় নাই। বিন্দুবাসিনীও এক সময়ে বালিকা ছিল, সুতরাং বিন্দু-বাসিনী প্রৌঢ়াবস্থায় এ সম্বন্ধে অনেক বহুদর্শীতা লাভ করি-য়াছে। আর বিন্দু স্ত্রীলোক, সে লীলার এই আকস্মিক

পরিবর্ত্তন যত শীঘ্র বুঝিতে পারিবে, লোকনাথের পক্ষে তত শীঘ্র বুঝিতে পারা অসম্ভব। বাস্তবিক বিন্দুবাসিনী লীলার এই পরিবর্ত্তন লোকনাথের অনেক পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল। আরো বুঝিতে পারিয়াছিল যে, লীলা সোমনাথেরই অনুরাগিনী। লীলা যদিও এপর্য্যন্ত কাহার নিকট সে কথা মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিয়া বলে নাই, তত্রাচ জননীর পক্ষে কন্যার এ মনের ভাব জানা অসম্ভব নহে। সোমনাথের সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন হইলেই লীলার মুখের ভাব যেরূপ হইত, সেই ভাব দেখিয়াই বিন্দুবাসিনী সোমনাথের প্রতি লীলার অনুরাগের বিষয় বুঝিতে পারিত। আর ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল বলিয়াই বিন্দুবাসিনী সোমনাথের পক্ষ অবলম্বন করিয়া স্বামীকে এই বিবাহে সম্মত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল।

লীলার এরূপ অবস্থা দেখিয়া লীলার জন্য বিন্দুবাসিনীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। বিন্দুবাসিনী স্বামীকে স্বমতে আনিবার জন্য পুনরায় চেষ্টা আরম্ভ করিল। এবার হঠাৎ একটা কথা মনে হইবামাত্র বলিল—"আচ্ছা, নরেনত এ গ্রামের মধ্যে খুব ভাল ছেলে, সেত সোমনাথের সকল পরিচয়ই জানে, সে যখন অত জোর করে বলছে—এ বিয়েতে কোন গোল হবে না, তখন তার কথাতেও কি তোমার বিশ্বাস হয় না?"

লোকনাথ এইবার বলিয়া উঠিল—"আর আমার এ বিয়ে অমত নাই। বিন্দু, এই সোমবারেই সোমনাথের সঙ্গে আমি লীলার বিয়ে দেবো—তা এতে আমার অদৃষ্টে যাই থাকুক। তুমি কালই গায়ে হলুদের উদ্যোগ কর।"

লোকনাথ কথা কয়েকটি এরূপ উচ্চৈঃস্বরে বলিল যে, গৃহমধ্যস্থিতা রোরুদ্যমানা লীলাময়ী পর্য্যন্তও তাহা শুনিতে পাইয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আজ সোমবার লীলাময়ীর সহিত সোমনাথের বিবাহ। সোমনাথ এ বিবাহের সংবাদ তাঁহার স্বদেশীয় কোন আত্মীয় বন্ধুকে দেন নাই, সুতরাং তাঁহারা এ বিবাহে কেহই উপস্থিত হন নাই। এ বিবাহের বরকর্ত্তা, আত্মীয়, স্বজন, সকলই তাঁহার বন্ধু নরেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্রনাথ আজ এরূপ ব্যস্ত যে, তাঁহারই বাড়ীতে আজ যেন তাঁহার সহোদর ভ্রাতার বিবাহ। বাস্তবিক বরপক্ষের সকল আয়োজন নরেন্দ্রনাথের বাড়ীতেই হইতেছিল। নরেন্দ্রনাথ বরপক্ষ হইতে গ্রামের সর্ব্বসাধারণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, এ দিকে কন্যাপক্ষ হইতেও সেই গ্রামের সর্ব্বসাধারণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। সুতরাং গ্রামের লোকে আজ বড়ই গোলে পড়িয়াছেন। এই গোলটা কিন্তু অন্য জাতির মধ্যে বড় দেখা গেল না, কেবল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যেই একটা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বৈকালে গ্রামের দলপতি কুড়মণি চক্রবর্ত্তীর চণ্ডিমণ্ডপে আজ একটা বৈঠক বসিয়াছে। একটা গুরুতর বিষয়ের মীমাংসার জন্য আজ সকলেই সেখানে উপস্থিত। বিষয়টা অন্য কিছুই নহে, কেবল আজ যে পাত্রটির সহিত লোকনাথের

কন্যার বিবাহ—সে পাত্রটি অজ্ঞাত কুলশীল, সুতরাং এরূপ স্থলে সে বিবাহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাওয়া যাইতে পারে কি না, এই বিষয়েরই একটা মীমাংসা। এ সম্বন্ধে দুইটী দল হইয়াছে বলিয়াই বিষয়টা গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কুড়মণি মহাশয়ের দল হইতেছে বিপক্ষ দল। তারাচরণ ভট্টাচার্য্যের দল হইতেছে স্বপক্ষ দল। তারাচরণ লোকনাথেরই পুরোহিত, সুতরাং তারাচরণ এই বিবাহে যাহাতে কোনরূপ গোলযোগ না হয়, তাহার জন্যই কুড়মণি মহাশয়ের চণ্ডিমণ্ডপে উপস্থিত। স্বপক্ষ এবং বিপক্ষ অন্যান্য অনেক লোকও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কুড়মণি মহাশয় টিকি নাড়িয়া বলিলেন—"বলি ওহে তারাচরণ দাদা, তোমার যজমান বলে কি আমরা ধর্ম্ম নষ্ট কর্‌বো না কি?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় কিন্তু শান্তভাবে উত্তর করিলেন—"রাম! রাম! আমি এমন উপরোধ তোমায় কেন কর্‌বো ভাই? কিন্তু একটা বিচার আছে তো?"

কুড়মণি। অবিশ্যি—অবিশ্যি বিচার আছে বই কি। কিন্তু তা বলি দাদা, বিচার না করেই কি এ মীমাংসাটা করা হয়েছে?

ভট্টা। আচ্ছা ভাই, বিচারটা কিরূপ হলো?

কুড়মণি মহাশয় এইবার অধিকতর উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"এত পড়েই রয়েছে, যখন পাত্রটি অজ্ঞাত কুলশীল, আর বাপপিতামহের নাম জিজ্ঞেস কর্‌লেও চট্ করে বল্‌তে পারে না, তখন বিচারত পড়েই রয়েছে।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুনরায় ধীরভাবে বলিলেন—"তোমারত ভাই এসকল শোনা কথা বইত নয়, কিন্তু আমি পাত্রটির সঙ্গে আলাপ করে দেখিছি যে ছেলেটির স্বভাব চরিত্র যেরূপ নম্র,

তাতে যে সে একজনের জাতকুল মজাবে, তাত আমার কোন মতেই বিশ্বাস হচ্ছে না।"

কুড়মণি। আরে দাদা তুমি বোঝ না, যারা লোকের জাত কুল মজায়, তাদের স্বভাব চরিত্র ঐ রকমইত হয়ে থাকে।

ভট্টা। আচ্ছা নরেনের কথায় কি করে অবিশ্বাস কর্‌বো?

কুড়মণি। আরে, ওরা দুজনে খুব বন্ধুত্ব। বন্ধু হলেই বন্ধুর দিকেইত টান্‌বে।

ভট্টা। পাত্রটি যে কায়স্থ নয়, এপ্রমাণ যখন কিছুই পাওয়া যায় না, তখন এরূপ কথা বলা বড় অন্যায়।

এই সময় কুড়মণির পক্ষীয় রামদাস ঘোষাল বলিল—"আচ্ছা, পাত্রটিত সঙ্গতিপন্ন শুন্‌ছি—তা আমাদের সম্মান দিলে সব গোল মিটে যেতে পারে।"

ভট্টা। সম্মানটা কি দিতে হবে?

রামদাস। বেশি নয়—পঁচিশ টাকা।

ভট্টা। এটা তা হলে জরিমানার স্বরূপ। কি অপরাধ করেছে যে এ দণ্ড দেবে? গ্রামভাটী, কি বারোয়ারী বলে বরং এ উপলক্ষে পঁচিশের স্থলে পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়াইয়া দিতে পারি।

পুনরায় কুড়মণি মহাশয় চিৎকার করিয়া উঠিল—"গ্রামভাটী আর বারোয়ারীত একশো টাকার এক পয়সা কম মিট্‌বে না; আর আমার সম্মানের জন্য রামধন খুড়ো যা বলেছেন—পঁচিশ টাকা অগ্রে নেবো, তবে এবিয়েতে নিমন্ত্রণ যাব, তা নৈলে আমার এ দলের সেখানে কেউ যাবে না।"

তখন তারাচরণ ভট্টাচার্য্য একটু রাগান্বিত হইয়া বলিলেন—"তবে তুমি দল নিয়েই থাক, আমরা চল্লুম।"

ব্রাহ্মণ সদলে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। কুড়মণি, রামদাস প্রভৃতি পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিলেন। সেইখানে খুদীরাম পরামাণিক বসিয়াছিল, ধূর্ত্ত পরামাণিক তখন নিজ যজমানের এমন একটা বিবাহকার্য্যে বিঘ্ন হয় দেখিয়া আরম্ভ করিল—"দাদা ঠাকুর, কাজটা কিন্তু ভাল হলো না; ব্রাহ্মণ ঠাকুরদের আহারের যে বন্দোবস্তটা দেখে এলাম, সে রকম আয়োজন এঅঞ্চলে কখন হয় নাই। কত রকম মেঠাই, কত রকম মিষ্টান্ন, কত রকম সন্দেশ, আরো কত রকম কি যে হয়েছে তা চখেও কখন দেখিনি, আর তার নামও কখন শুনিনি। শুন্‌ছি এই সব জিনিষ তিন চারিখানা সরা সাজিয়ে নাকি প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে দেওয়া হবে। তা আপনাদের ন্যায় ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলো না পড়লে, সে ব্রাহ্মণভোজন যে পণ্ড হয়ে যাবে?"

পরামাণিকের বক্তৃতার যে মোহিনীশক্তি তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যুক্তিতে যে ফল না হইল, পরামাণিকের বক্তৃতায় তাহা অপেক্ষা অধিক ফল ফলিল। তখন দলপতি কুড়মণি মহাশয় বলিলেন—"তারাচরণ দাদা যে দেখ্‌ছি রাগ করে চলে গেল, বলি ব্রাহ্মণ অভিসম্পাত কর্‌বে না ত?"

রামদাস ঘোষাল বলিল—"আরো দেখ কুড়মণি, লোকনাথ বেছারা বড় ভাল মানুষ, তার মনে কষ্ট দেওয়াটা ভাল নয়।"

তৎক্ষণাৎ তাঁহারই আর এক জ্ঞাতি প্যারিমোহন বলিল—"পাত্রটি দেখ্‌লেও কিন্তু বদমায়েস বলে মনে হয় না।"

একজন অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেখানে বসিয়া তামাক খাইতে-ছিলেন, কুড়মণি মহাশয় তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"কি বল্লেন শিরোমণি মহাশয়?"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তখন ধীরে ধীরে হুকাটি কুড়মণির হাতে দিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—"তা বাবা, ফলারটা অনেক দিন হয়নি, ক্রিয়া কর্ম্মত এক রকম উঠেই গেছে বল্লে হয়—তা যখন পরামাণিকেরপো বলছে আয়োজনটাও ভাল রকম হবে, তখন আর এ শুভকর্ম্মে বাধাটা কেন?"

কুড়মণি তখন বলিতে লাগিলেন—"তাইত—তাইত—কিন্তু তারাচরণ দাদা চলে গেলেন, এখন তাঁকে সংবাদটা কি করে দেওয়া যায়?"

খুদীরাম পরামাণিক তখন গললগ্নবাসে যোড়হস্তে বলিল—"কেন প্রভু—এ দাসত হাজির আছে।"

তখন প্রথমেই খুদীরাম পরামাণিকের সুখ্যাতির ধূম পড়িয়া গেল। খুদীরামের ন্যায় দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি এ গ্রামের কাহারও নাই—খুদীরামের ন্যায় ক্ষৌরকার্য্যে সুনিপুণ এ অঞ্চলে কেহই নাই—খুদীরামের ন্যায় বুদ্ধিবান লোকও পরামাণিকবংশে কোন কালে জন্মগ্রহণ করে নাই ইত্যাদি, ইত্যাদি। তাহার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে খুদীরামকেই দূত করিয়া তারাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট পাঠান হইল। এক পরামাণিকের বুদ্ধিকৌশলে দলাদলির সকল গোলযোগ মিটিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ।

লীলাময়ীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আজ দলে দলে গ্রামের স্ত্রীলোকেরা লীলাকে দেখিতে আসিতেছে। দরিদ্র বিন্দুবাসিনীর অদৃষ্ট যেন একদিনের মধ্যেই ফিরিয়া গিয়াছে, এখন তাহার অনেক আত্মীয় স্বজন দর্শন দিয়াছেন। বর ক'নে দেখিবার সাধ সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকের মধ্যেই প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাদিগকে প্রতিদিন দেখিতেছে, তাহাদিগকেও একবার বর ক'নে অবস্থায় দেখিবার জন্য স্ত্রীলোকমাত্রেই অধীরা হইয়া পড়ে। মনুষ্যজীবনের এরূপ বিশেষ ঘটনা আর আছে কি?

লীলা এখন সোমনাথের হইয়াছে, সোমনাথের আনন্দের সীমা কে করিবে? কিন্তু এ আনন্দও সোমনাথকে অধীর করিয়া তুলিতে পারে নাই—সোমনাথের প্রকৃতি সেরূপ নহে। আর লীলা?—ক্ষুদ্র লীলার মনের ভাব আমরা কিরূপে বুঝাইব—লীলা নিজেই তাহা বুঝিতে পারে নাই।

সোমনাথের বহুদিনের আশা আজ পূর্ণ হইয়াছে। সোমনাথ নির্জ্জনে লীলাকে পাইয়াছে। লীলার কিন্তু সোমনাথের নিকট নির্জ্জনে থাকিতে ততদূর ইচ্ছা নাই, কারণ এখনও সোমনাথের নিকট নির্জ্জনে থাকিতে লীলার বড়ই লজ্জাবোধ হয়। এক ভারতবর্ষ ভিন্ন এরূপ লজ্জামিশ্রিত প্রণয়ের দৃশ্য আর কোথাও আছে কি?

সোমনাথ এইবার প্রশ্ন করিল—"লীলা, তুমি কি আমায় ভালবাস ?"

লীলা অবগুণ্ঠন না খুলিয়া আর একটিও কথা না কহিয়া মাত্র ঘাড় নাড়িয়া সে প্রশ্নের উত্তরে আপনার হৃদয়নিহিত ভালবাসা জানাইল। সোমনাথ ঈষৎ হাসিয়া সে অবগুণ্ঠন স্বহস্তে খুলিয়া দিল, লীলা অমনি লজ্জায় জড়সড় হইয়া সোমনাথের কোলেই মুখ লুকাইল। সে কোমল দেহ স্পর্শে সোমনাথের দেহ যেন ক্রমে অবসন্ন হইতে লাগিল। সোমনাথ ধীরে ধীরে লীলাকে স্বহস্তে ধরিয়া তুলিল। লীলা তখন আপনার হস্তের অঙ্গুলিতে মুখখানি ঢাকিয়া ফেলিল। সোমনাথ এইবার লীলার হস্ত ধরিয়া টানিল, এতক্ষণ যে মুখখানি দেখিবার জন্য সোমনাথ এতদূর ব্যগ্র, এইবার সেই মুখখানি দেখিতে পাইল। মুখের আবরণ খুলিয়া গেলেই লীলা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। সে বৈদ্যুতিক হাসির আলোকে সোমনাথের হৃদয়ের প্রতি কক্ষ আলোকিত হইল। কিন্তু এখনও বালিকা লজ্জার হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। লীলা লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া রহিল।

সোমনাথ বলিল—"লীলা, কাল আমি তোমায় বাড়ী নিয়ে যাব, তুমি যাবে ত ?" লীলা এইবার কথা কহিল—"যাব। কিন্তু মা আর বাবাকে সঙ্গে নিতে হবে।"

সোম। তোমার বাপ সঙ্গে যাবেন, কিন্তু তোমার মা ত এখন যাবেন না।

লীলা। কেন যাবেন না ?

সোম। তুমি মা ছেড়ে কি থাক্‌তে পার্‌বে না ?

লীলা। মার জন্য বড় মন কেমন কর্‌বে।

সোম। আচ্ছা, লীলা, কাল যদি আমি তোমায় এখানে রেখে বাড়ী চলে যাই, তবে কি আমার জন্য একটুও মন কেমন কর্‌বে না ?

লীলা এই প্রশ্নে লজ্জায় জড়সড় হইয়া গেল, সোমনাথের অনেক জেদাজিদীর পর উত্তর করিল—"কর্‌বে।"

লীলার সেই ক্ষুদ্র কথাটিতে সোমনাথ যেন স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইল। সোমনাথ বলিল—"তোমার মাকে তুমি জেদ করো, তা হ'লে তিনিও যেতে পারেন।"

লীলা। আমরা সকলে সে যাব, তোমাদের ক'খানা ঘর ?

সোম। ঘর যা আছে, তাতে তোমরা সকলে গেলে কোন কষ্ট হবে না।

লীলা। হাঁগা, মা বলে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে খুব কাজকর্ম্ম কর্‌তে হয়, তা তোমাদের বাড়ীর কাছে পুকুর আছেত ? কাছে পুকুর থাক্‌লে আমি খুব কাজ কর্‌তে পারি।

সোম। সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই লীলা।

লীলা। আচ্ছা, সেখানে গিয়ে যদি প্রথম প্রথম বেশী কাজকর্ম্ম না কর্‌তে পারি, তবে কি তোমরা আমায় বক্‌বে ?

সোম। না লীলা, সে জন্য কেউ তোমায় বক্‌বে না।

লীলা। দেখ, আমি সব কাজ কর্‌তে পারি, কিন্তু এখনও ভাল রাঁধ্‌তে শিখি নাই। মা আমায় রাঁধ্‌তে দেয় না যে।

সোম। তোমায় কখন রাঁধ্‌তে হবে না।

সোমনাথের এই কথা শুনিয়া লীলা আশ্চর্য্য হইল, তৎক্ষণাৎ বালিকার সেই অবনত মস্তক উন্নত হইয়া উঠিল। ক্ষণেকের

জন্য লীলা যেন লজ্জার হাত হইতে অব্যাহতি পাইল। এইবার লীলা বলিল—"আমায় কখন রাঁধ্‌তে হবে না কেন ?

সোম। তুমি রাঁধ্‌তে জাননা বলেই বল্‌ছি।

লীলা। জানি না বলে কি আমায় শিখ্‌তে হবে না—মেয়ে মানুষে ভাল রাঁধ্‌তে না শিখ্‌লে সকলে নিন্দে কর্‌বে যে।

সোম। আচ্ছা, তুমি রান্না শিখ্‌তে ইচ্ছে কর, তাই শিখ্‌বে।

লীলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"তুমি কেন, এইখানেই থাক না, আমাদের একখানা ঘর বলে যদি তোমার কষ্ট হয়, মা বলেন তিনি না হয় পাড়ার কারু বাড়ীতে গিয়ে শোবেন।"

সোম। আমার কি ঘর বাড়ী নাই যে, আমি এখানে থাক্‌বো ? আর দেখ লীলা, এখন এ বাড়ীত আর তোমার নয়, আমার যে বাড়ী আছে, এখন সেই বাড়ীই তোমার।

লীলা। এ আমার বাপের বাড়ী, আর সে আমার শ্বশুর বাড়ী—এবাড়ীও আমার, আর সে বাড়ীও আমার।

সোম। আচ্ছা তবে তাই।

লীলা। সেখানে কয়খানা ঘর আছে ?

সোম। এ কথা কেন লীলা ?

লীলা। সকাল বেলা উঠে, আমায় নিকুতে হবে না ?

সোমনাথ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"সেখানে গেলেই দেখ্‌তে পাবে।"

এইরূপ নানাপ্রকার কথাবার্ত্তায় সে রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতে সোমনাথ স্বদেশ যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সোমনাথের দেশ বিরামপুর। বিজয়নগর হইতে নৌকা করিয়া কলিকাতায় আসিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠিলে বিরামপুরে যাওয়া যায়।

প্রাতে আহারাদির পর সোমনাথ ও লীলাময়ীর সঙ্গে লোকনাথ, নরেন্দ্রনাথ আর একজন নীচবংশীয়া স্ত্রীলোক এই তিন জন মাত্র যাওয়া স্থির হইল। লোকনাথ জামাতার ঘর বাড়ী স্বচক্ষে দেখিয়া আসিবে বলিয়া চলিয়াছিল, আর নরেন্দ্রনাথ সোমনাথের অনুরোধে এই প্রথম তাঁহাদের দেশ দেখিতে চলিয়াছিলেন। অনেক দিনের বন্ধুত্ব হইলেও ইহার পুর্ব্বে আর কখন তিনি সোমনাথের বাড়ী দেখেন নাই।

বিন্দুবাসিনী আজ প্রাতঃকাল হইতেই কান্না আরম্ভ করিয়াছে। লোকনাথ তাঁহাকে কত বুঝাইতেছে, কিন্তু বিন্দুবাসিনীর মন কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না। এতদিন বিন্দুবাসিনী লীলার বিবাহের জন্য লালায়িত ছিল, কিন্তু এই বিবাহ কার্য্য শেষ হওয়াতেই যে তাঁহার লীলা পর হইয়া গেল, এই চিন্তাতেই তিনি আজ অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। আর লীলাময়ীর জন্মাবধি একদিনের জন্যও লীলা মা ছাড়া হয় নাই, এখন লীলা তাহাকে ছাড়িয়া কিরূপে থাকিবেন, ইহাও তাঁহার মনোকষ্টের দ্বিতীয় কারণ। বিবাহ রাত্রের আনন্দ ও উৎসবের পর

কন্যা শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার সময় ক্রন্দন করা, স্ত্রীলোকদিগের চিরপ্রথা।

কেবল বিন্দুবাসিনী যে ক্রন্দন করিতেছিল,তাহা নহে। বিন্দুর সঙ্গে সঙ্গে লীলাও আজ প্রাতঃকাল হইতেই ক্রন্দন আরম্ভ করিয়াছে। পিতা সঙ্গে চলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু জননীকে ছাড়িয়া লীলা কিরূপে থাকিবে—ইহাই তাহার ক্রন্দনের কারণ। গ্রামের অনেক স্ত্রীলোক আজও লীলাকে দেখিতে আসিয়াছে, কেহ তাহার চুল বাঁধিয়া দিতেছে, কেহ আল্‌তা পরাইতেছে, আর কেহ বা গা মুছিয়া দিতেছে।

ক্রমে ক্রমে যাত্রা করিবার সময় উপস্থিত হইল। তখন লীলা কাঁদিতে কাঁদিতে পাল্‌কীতে গিয়া উঠিল। বিন্দুবাসিনী এই সময় একবারে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল। অর্দ্ধ পোয়া রাস্তা পদব্রজে চলিয়া গিয়া সোমনাথ, নরেন্দ্রনাথ ও লোকনাথ ইতঃপূর্ব্বেই নৌকায় গিয়া উঠিয়া বসিয়াছিলেন, কেবল সেই স্ত্রীলোকটী পাল্‌কীর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া চলিল।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় তাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলেন। কিন্তু গাড়ীর সময় অতীত হইয়া যাওয়ায় সে দিন আর বিরামপুর যাত্রা করা হইল না।

পরদিন যথাসময়ে সকলে সিয়ালদহের ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল। সোমনাথ বিরামপুর পর্য্যন্ত একখানি প্রথম শ্রেণীর কাম্‌রা পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট (Reserved) করিয়া রাখিয়াছিলেন। লীলাময়ী ইহার পূর্ব্বে কখন কলিকাতা দেখে নাই, সুতরাং ষ্টেশনে আসিতে কলিকাতার যে অংশ দেখিতে পাইয়াছিল, তাহাতেই বিস্মিত হইয়া গেল। লীলাময়ী এখন আর

কাঁদে না, কলিকাতা দেখিয়া এবং কলের গাড়ী চড়িবার আশায় তাহার কান্না থামিয়া গিয়াছিল। লোকনাথ ইহার পূর্ব্বে ২। ১ বার কলিকাতা দেখিয়াছিল, এবং কলের গাড়িতেও চড়িয়াছিল, সুতরাং লোকনাথ এই সকল দেখিয়া লীলাময়ীর মতন বিস্মিত হয় নাই।

লোকনাথ ষ্টেশনে আসিয়া প্রথমেই হুকা তামাকের বন্দোবস্তের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। লীলাময়ী ও সেই স্ত্রীলোকটীকে গাড়িতে উঠাইয়া দিয়া সোমানাথ ও নরেন্দ্রনাথ লোকনাথের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, গাড়ী ছাড়িবার যখন ৫ মিনিট মাত্র অবশিষ্ঠ আছে, এমন সময় লোকনাথ হাঁপাইতে হাঁপাইতে হুকা তামাক ইত্যাদি লইয়া উপস্থিত হইল। নরেন্দ্রনাথই প্রথম তাহাকে দেখিতে পাইলেন, এবং চিৎকার করিয়া বলিলেন—"ঘোষজা মহাশয়, শীগ্‌গির আসুন—শীগ্‌গির আসুন।"

এই কথা বলিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। লোকনাথ প্রাণপণে দৌড়িয়া সেই গাড়ীর নিকট আসিল বটে, কিন্তু গাড়ী দেখিয়া তাহার সে গাড়ীতে আর উঠিতে সাহস হইল না, তৎক্ষণাৎ চিৎকার করিয়া বলিল— "করেছেন কি! ও যে সাহেবদের গাড়ী—এখনি পুলিষে দেবে —নামুন—শীগ্‌গির নামুন।"

সোমনাথ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"আপনার কোন ভয় নাই, এ আমাদেরই গাড়ী—আপ্‌নি শীগ্‌গির উঠে পড়ুন।"

লোক। তোমরা ছেলে মানুষ জাননা, আমি বেশ জানি এ গাড়ী সাহেবদের। এখ্‌নি একটা বিপদ হবে দেখ্‌ছি।

এই সময় নরেন্দ্রনাথ বলিলেন—"কোন বিপদ হবে না—

পয়সা বেশী দিলেই সাহেবদের গাড়ী বাঙ্গালির হয়। আপনি কেন ভয় পাচ্ছেন।"

লোকনাথের সন্দেহ এখনও দূর হয় নাই, তিনি ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় বড়ই কাতর হইয়া বলিলেন—"বাপু অমন কথা মুখে এনো না, সাহেবদের কি পয়সার অভাব আছে, যে পয়সার খাতিরে তাহাদের গাড়ীতে বাঙ্গালিদের চড়তে দেবে ?"

নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন যে বৃথা তর্কে কোন ফল হইবে না, আর এদিকেও ট্রেণ ছাড়িবার আর বিলম্ব নাই, সুতরাং তিনি পুনরায় গাড়ী হইতে নামিয়া লোকনাথের হাত ধরিয়া জোর করিয়া তাহাকে গাড়ীতে আনিয়া তুলিলেন। এই সময় গাড়িও ছাড়িয়া দিল, লোকনাথ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে গাড়ীর এক কোণে দাঁড়াইয়া নরেন্দ্রনাথকে বলিল—"বাপু, তুমিই জোর করে আমায় এই গাড়ীতে তুলেছ, কিন্তু আমি বেশ জানি এ সাহেব-দের গাড়ী। এখন কোন বিপদ না হ'লেই বাঁচি।"

নরেন্দ্র বাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"আপনি জানেন না, বরক'নে যে সাহেবদের গাড়ীতে যেতে পারে।"

এইবার নরেন্দ্রনাথের কথায় লোকনাথের বিশ্বাস হইল। লোকনাথ তখন প্রফুল্লমুখে বলিল—"বটে—বটে; এতক্ষণ এ কথা আমায় বল না কেন ?"

এই কথা কয়েকটী বলিয়া লোকনাথ নিশ্চিন্ত হইয়া একস্থানে বসিল। তখন রেলের গাড়ী অবিশ্রান্ত ছুটিতেছে, দেখিতে দেখিতে দমদমা, বেলঘরিয়া, সোদপুর প্রভৃতি ছাড়াইয়া গাড়ী একবারে ব্যারাকপুরে আসিয়া পৌছিল। এখানি মেল ট্রেণ, সেই কারণ সকল ষ্টেশনে গাড়ীথামিল না। লোকনাথ জীবনে

কখন প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে উঠে নাই. সুতরাং অবাক্ হইয়া কেবল গাড়ীর শোভাই দেখিতেছে। লীলাময়ী লজ্জায় জড়সড় হইয়া সঙ্গিনী স্ত্রীলোকের অঙ্গে একবারে ঢলিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, সুতরাং লীলা কিছুই দেখিতেছিল না। সোমনাথ আর নরেন্দ্রনাথ মাঠের শোভা, গাছের শোভা, আর আকাশের শোভা দেখিতে দেখিতে প্রফুল্লমনে চলিয়াছেন।

সন্ধ্যার সময় দামুকদিয়ার ঘাটে গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। এইখানে গাড়ী ছাড়িয়া ষ্টিমারে পদ্মা পার হইতে হয়। লোকনাথ পূর্ব্বে পদ্মার নাম শুনিয়াছিল, এক্ষণে সেই পদ্মা পার হইতে হইবে শুনিয়া বড়ই ভীত হইয়া ইষ্টনাম জপ আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু যখন অসংখ্য যাত্রীপূর্ণ পদ্মাতীরস্থিত সেই বৃহৎ ষ্টিমারে উঠিল, তখন আর তাহার মনে কোনরূপ ভয় রহিল না।

পরপারেও তাঁহাদের জন্য রেলেরগাড়ী প্রস্তুত ছিল, এখানেও তাঁহারা সকলে এক নির্দ্দিষ্ট প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিলেন। অতি প্রত্যূষে গাড়ী বিরামপুরে আসিয়া পৌছিল। লোকনাথ বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া দেখিল যে, ষ্টেশনে লোকে লোকারণ্য। সিপাহী, বরকন্দাজ, সহিস, কোচ্ম্যান, এবং বহুসংখ্যক ভদ্রলোকে ষ্টেশনে পরিপূর্ণ, সকলেই যেন উৎসুক নেত্রে গাড়ীর প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। গাড়ী ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিবামাত্র সেই অসংখ্য জনস্রোত হইতে শতসহস্রও অভিবাদনও সেলামের ধুম পড়িয়া গেল। লোকনাথের অধিকতর বিস্ময়ের কারণ এই যে তিনি স্বচক্ষে দেখিলেন যে তাঁহারই জামাতাকেই লক্ষ্য করিয়া সেই সকল অভিবাদন ও সেলাম হইতেছে; এবং তাঁহার জামাতাও সেই সকল অভিবাদন ও

সেলামের প্রতিদান করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে অসংখ্য সেপাহী ও বরকন্দাজ পরিবেষ্টিত এবং মূল্যবান আচ্ছাদনে আবৃত একখানি সুন্দর পাল্‌কী আসিয়া তাঁহাদের সেই গাড়ীর দরজায় আসিয়া লাগিল। সোমনাথ স্বহস্তে লীলাময়ীর হাত ধরিয়া সেই পাল্‌কীর মধ্যে তাহাকে তুলিয়া দিলেন। লীলার তৎকালীন মানসিক অবস্থার বিষয় আমরা এখনও কোন পরিচয় পাই নাই, কিন্তু পাল্‌কীতে তুলিবার সময় সোমনাথ দেখিল যে লীলা এত অধিক ঘামিয়াছে যে সেই ঘামে তাহার পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত ভিজিয়া গিয়াছে!

লীলাকে পাঠাইয়া দিয়া সোমনাথ সমাগত ভদ্রলোকদিগের সহিত কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সকলকেই অতিরিক্ত সম্মানের সহিত সোমনাথের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে দেখিয়া লোকনাথ হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছেন। কথা কহিতে কহিতে সকলেই ষ্টেশনের বাহিরে আসিলেন, সেখানে আসিয়া লোকনাথ দেখিল গাড়ী, ঘোড়া, হাতী, ও বাদ্যকরগণ প্রভৃতিতে রাস্তা পরিপূর্ণ, আর সেখান হইতে যতদূর মাঠ দৃষ্টিগোচর হইতেছে সেই পর্য্যন্ত অসংখ্য জনস্রোতে মাঠও পরিপূর্ণ। লোকনাথ পূর্ব্বে কখন হাতী দেখে নাই, এখানে আসিয়া দেখিল দশ পোনেরটি হাতী নানারকম চিত্রবিচিত্র সাজসজ্জায় সুশোভিত হইয়াছে, এবং শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। চার্‌ব্যাং, বেরুস্‌, ব্রুহাম, ফিটন, পাল্‌কী প্রভৃতি নানা ফ্যাসানের নানা বর্ণের গাড়ী সকল সুদৃশ্য ও বলবান অশ্বগণের সহিত সংযোজিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত রহিয়াছে। ঢাক্‌, ঢোল, কাড়া, নাগ্‌রা, সানাই প্রভৃতি অসংখ্য বাদ্যকরগণ দূরে দেখা

যাইতেছে, তাহাদের অগ্রে ধ্বজা আসাশোঁটা প্রভৃতিধারী অসংখ্য লোক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান!

সে দৃশ্য দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে সিয়ালদহ ষ্টেশনে সোমনাথের নববধূর রহনা হইবার সংবাদ মাত্র তারযোগে পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু ১০।১২ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহাদের অভ্যর্থনার এরূপ বিরাট আয়োজন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তাহা তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। লোকনাথের মুখে ত কথা নাই, লোকনাথ ভাবিতেছিল—এ সত্য—না স্বপ্ন? এই প্রশ্নের কোন রকম মীমাংসা করিতে না পারিয়া লোক নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিল—"এত গাড়ী, ঘোড়া, হাতী লোকজন এসকল কার?"

নরেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন—"এ সকল এ দেশের রাজার। রাজা সোমনাথকে বড় ভাল বাসেন, আজ সোমনাথ বিবাহ করে আস্‌ছেন শুনে তিনি নিজে বর ক'নেকে অভ্যর্থনা করতে এসেছেন। তাই এসব সেই রাজারই সঙ্গে এসেছে। এখন আমাদের প্রথমে সেই রাজার বাড়ীতেই যেতে হবে।"

লোকনাথ এতক্ষণে একটু সুস্থির হইল, স্বপ্ন বলিয়া মনে মনে যে একটা ভ্রম জন্মিয়াছিল, সে ভ্রমও দূর হইল। এই সময় সোমনাথ লোকনাথ ও নরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া সেই অসংখ্য গাড়ী'র মধ্য হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গাড়ীখানিতে উঠিলেন। গাড়ী ধীরে ধীরে চলিল। এই সময় সেই অসংখ্য জনস্রোতের মধ্য হইতে একটা ভয়ানক কোলাহল উত্থিত হইল। কোলাহলের সঙ্গে সঙ্গে সেই অসংখ্য ঢাক, ঢোল প্রভৃতি বাজিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ যে যাহার স্থানে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। অনেক

গুলি ভদ্রলোক তাঁহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে সাহায্য করিতে লাগিল। তখন লীলাময়ীর সেই পাল্কী খানি সোমনাথের গাড়ীর পশ্চাতেই চলিল।

লোকনাথ জীবনে কখন রাজা দেখে নাই, এখন রাজার এই সকল আস্‌বাব দেখিয়া রাজাকে দেখিবার জন্য তাঁহার মন বড় ব্যস্ত হইল, লোকনাথ ব্যস্ততার সহিত কেবল চারিদিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া সোমনাথ ও নরেন্দ্র নাথকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনাদের রাজা কই ? আমি কখন রাজা দেখিনি।"

সোমনাথ উত্তর করিলেন—"রাজা অগ্রেই চলে' গেছেন, রাজবাটীতে গেলেই রাজাকে দেখ্‌তে পাবেন।"

এই সময় গাড়ী রাজবাটীর প্রথম গেটে প্রবেশ করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সেই গেট নানা বর্ণের ফুল, পাতা ও ধ্বজা পতাকায় সুসজ্জিত। গেটের উপর একদল নহবৎ অতি সুললিত তানে বাদ্য আরম্ভ করিয়াছে। গেট পার হইলেই সম্মুখে একটী সুপ্রশস্ত সরল রাস্তা, রাস্তার দুই পার্শ্বে বিলাতি ঝাউ গাছের শ্রেণী। ঝাউগাছ শ্রেণীর পরেই নবদূর্ব্বাদল সুশোভিত বিস্তীর্ণ ময়দান—যেন দুই দিকে দুই খানি সবুজ বর্ণের গালিচা পাতা করিয়াছে। স্থানে স্থানে তাহার উপর নানা ভাবব্যঞ্জক শ্বেত প্রস্তর-

নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি দর্শকগণের মনে নানা ভাবের উদ্রেক করিতেছে। এরূপ কিছুদূর গিয়া পুনরায় আর একটী গেট; এই গেটও প্রথম গেটের ন্যায় সুসজ্জিত, তবে ইহা প্রথম অপেক্ষা আয়তনে বৃহৎ। অধিকন্তু ইহার মধ্যে দুই পার্শ্বেই দ্বাররক্ষকদিগের থাকিবার স্থান আছে। উপরে নহবতের সানাইদার মধুর তানে ললিতরাগিনীর আলাপ আরম্ভ করিয়াছে। এই গেট পার হইলেই রাস্তার উভয় পার্শ্বে সুন্দর পুষ্পোদ্যান। একবার চাহিয়া দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায় যে, এই উদ্যান অতি যত্নে সংরক্ষিত। দেশী ও বিলাতি নানা জাতীয় ও নানা বর্ণের প্রস্ফুটিত ও প্রস্ফুটিতোন্মুখ ফুলে যেন উদ্যান আলো করিয়া রহিয়াছে। উদ্যানমধ্যস্থিত রাস্তার প্রত্যেক চৌমাথায় এক একটী লতামণ্ডিত মন্দিরাকৃতি কুঞ্জবন, সে কুঞ্জবনও পুষ্পশূন্য নহে। এই উদ্যানের মধ্যেও গোলাকার, চতুষ্কোণ প্রভৃতি নানা আকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ময়দান আছে, এ সকল ময়দানের মধ্যস্থলে এক একটী ফোয়ারা স্থাপিত. প্রত্যেক ফোয়ারার কার্য্য আবার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। ফোয়ারার চারিদিকে বসিবার আসনও সজ্জিত ছিল। তবে অপেক্ষাকৃত একটী বড় ময়দানের মধ্যস্থলে ফোয়ারার পরিবর্ত্তে ইংরাজি ব্যাণ্ড বাজাইবার স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে।

রাস্তার ডানদিকের পুষ্পোদ্যানের পশ্চাতেই চিঁড়িয়াখানা, সেখানে অসংখ্য জীবজন্তু ইষ্টক নির্ম্মিতগৃহে বিশেষ যত্নে প্রতিপালিত হইতেছে। আর বামদিকের পুষ্পোদ্যানের পশ্চাতেই অশ্ব ও হস্তিশালা, সেখানেও বহুসংখ্যক ঘোড়া ও হাতির বাসোপযোগী সুদীর্ঘ ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহশ্রেণী। দ্বিতীয় গেট পার হইয়া কিছু দূর যাইলেই সম্মুখে রাজবাটী। সিংহদ্বারে দ্বাররক্ষকদিগের

নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত রহিয়াছে। সর্ব্বদা ব্যবহার না হইলেও সে সকল অস্ত্রশস্ত্র যে বিশেষ যত্নে সংরক্ষিত, তাহা একবার দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

প্রথম মহল পূজার বাড়ী। প্রবেশ করিবামাত্র সম্মুখেই এক বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়। ডানদিকে এক বৃহৎ পূজার দালান, সেরূপ উচ্চ ও বৃহৎ খিলানযুক্ত দালান সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। দালানের দুই পার্শ্বে দুইটী বড় বড় ঘর, আর চারিদিক চক্‌মিলান।

এই মহলের উত্তরেই অতিথিশালা। এখানে প্রতিদিন শত শত কাঙ্গালিভোজন হয় এবং যাহারা স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করেন, সে সকল অতিথিদিগকে সিদা বিতরণ হইয়া থাকে। এই স্থান সর্ব্বদা কোলাহলে পরিপূর্ণ, কখনই নীরব দেখিতে পাওয়া যায় না। এ মহলেও এক অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, অন্নপূর্ণার ভোগের প্রসাদেই কাঙ্গালিভোজন হয়।

পূজার মহলের দক্ষিণে ভাণ্ডার মহল। এই মহলে প্রবেশ করিলেই প্রথমেই সম্মুখে কয়েকটা বড় বড় গোলা দেখিতে পাওয়া যায়। গোলাগুলি চাউল, ময়দা, ডাউল ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। তাহার পর একটী প্রকাণ্ড হলে সময়োপযোগী নানাবিধ তরকারী সকল স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইবেন। হলের দুই দিকে দুইটী কুঠরী। একটী ঘৃত, তৈল, লবণ প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ, আর একটী পানমসলা ও ঝালমসলা প্রভৃতিতে বোঝাই। এই মহলে দুই খানা প্রকাণ্ড চালাও আছে, একখানাতে জ্বালানিকাষ্ঠ স্তূপাকার করা আছে, আর

অন্য খানা হাঁড়ি, সরা ও মালসা ইত্যাদিতে সজ্জিত রহিয়াছে। অতিথি এবং অন্যান্য অভ্যাগত লোককে যে সিদা দিবার রীতি আছে, তাহা এই মহল হইতেই বিতরিত হইয়া থাকে। সুতরাং এস্থলও বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ভয়ানক কোলাহলে পরিপূর্ণ দেখিতে পাইবেন।

পূজার মহলের পরেই আর এক মহল। এই মহল দ্বিতল, নিম্নতল জমীদারী সেরেস্তার কার্য্যেই সমস্ত অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। যে দিকে চাও, সেই দিকই রাশি রাশি পুরাতন জমিদারী সেরেস্তার কাগজাদিতে পরিপূর্ণ, আর শত শত জমা-নবীশ ও নকলনবীশ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বসিয়া গিয়াছে, আর তাহাদের মধ্যে মধ্যে অপেক্ষাকৃত উচ্চপদস্থ দাওয়ান ও নায়েব প্রভৃতিও সে স্থানের শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। এ সকল গৃহ সেরূপ সুসজ্জিত নহে, কিন্তু এই নিম্নতলের একটী বিস্তীর্ণ গৃহ কেবল বিশেষরূপ সজ্জিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই গৃহে রাজা স্বয়ং কাছারী করেন। প্রায় প্রতিদিন প্রাতে ৭টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত কাছারী হয়। প্রজাগণের মধ্যে যাহার যে কোন নালিশ থাকে, সে ব্যক্তি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া রাজাকে সে বিষয় জানাইতে পারে, রাজা স্বয়ং সে সকল নালিসের বিচার করেন। সরকারী কর্ম্মচারীগণেরও কোন রূপ প্রার্থনা থাকিলে এই কাছারিতে রাজাকে সে বিষয় জানাইতে হয়।

উপর তলে উঠিলে প্রথমেই একটী প্রকাণ্ড হলগৃহ দেখিতে পাইবেন। সেরূপ সুসজ্জিত হলগৃহ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবেশ করিবা মাত্র সর্ব্বাগ্রে দুই দিকের দুই খানা প্রকাণ্ড দর্পণ তোমার চক্ষু আকর্ষণ করিবে। সেরূপ প্রকাণ্ড দর্পণ

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। যে দিকে চাও, কেবল বিলাতি দ্রব্যের চাক্‌চিক্যে তুমি মোহিত হইয়া যাইবে। ঐ দেখ—তোমার মস্তকের উপর স্ফটিকের টানাপাখায় কেমন সুন্দর ভেলভেটের ঝালোর ঝুলিতেছে। আর মধ্যস্থলে আরো একটু ঊর্দ্ধে দুই শত বাতির কি প্রকাণ্ড ঝাড়! সে বিস্তীর্ণ গৃহে সেই একটী ব্যতীত আর ঝাড়ের আবশ্যক হয় না, তবে শোভার জন্য দেয়ালের গায়ে বেলোয়ারি দেয়ালগিরী অনেকগুলি আছে। আর দেয়ালগিরীর মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট অনেক গুলি আয়নাও সুন্দর ভাবে সজ্জিত রহিয়াছে। আরো ঊর্দ্ধে প্রত্যেক জানালা ও দরজার উপর নানা প্রকার তৈলরঞ্জিত ছোট বড় বিলাতী ছবি সকল পছন্দমত সাজান আছে। চারিদিকে বিচিত্র মূল্যবান্ বস্ত্রে আবৃত নানা প্রকার সোফা, চেয়ার, ও অটোম্যান্ গৃহের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে দেয়ালে সংলগ্ন টেবেলে নানা প্রকার কৃত্রিম ফুল, ফল, লতা, গাছ এবং ছোট ছোট জীবজন্তু সকল শিল্পকারগণের অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে। মেজের উপর এক-খানি সুন্দর কারপেট বিস্তীর্ণ রহিয়াছে।

হলঘরের পূর্ব্বাংশে যে গৃহ সে গৃহে প্রবেশ করিলেই চন্দ-নের সৌগন্ধে হঠাৎ তোমার মন আমোদিত হইয়া যাইবে। সে গৃহের সমস্ত দরজা, চৌকাট, খড়খড়ি, প্রভৃতি চন্দনকাষ্ঠে নির্ম্মিত। যে সকল আলমারিরা, গ্ল্যাসকেশ, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি দেখিতে পাইতেছ, সে সমস্তই চন্দন কাষ্ঠে প্রস্তুত। এই গৃহে রাজার পরিচ্ছদ ও নিত্যব্যবহারোপযোগী সৌগন্ধ দ্রব্যাদি সকল যথাস্থানে সজ্জিত রহিয়াছে।

হলঘরের পশ্চিমাংশে বৈটকখানা। সেখানে উত্তম ফরাসের বিছানা করা ও সারি সারি তাকিয়া সাজান এবং দেয়ালে নানা দেব দেবীর ছবি। ছবিগুলি দেশীয় শিল্পকারের চিত্রিত। দেবদেবীর ছবি ব্যতীত এই গৃহে দুইখানি অয়েলপেণ্টিংও আছে। একখানি দেখিলেই আমাদের পরিচিত সোমনাথের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়, অন্যখানি কাহার প্রতিমূর্ত্তি তাহা আমরা জানি না, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, সোমনাথের প্রতিমূর্ত্তির সহিতও ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

দ্বিতলে আর একটি প্রকাণ্ড ঘর আছে। সচরাচর সকলে তাহাকে 'নাচঘর' বলিয়া থাকে। কোনরূপ উৎসব উপলক্ষে পূর্ব্বে এই গৃহে অনেক বাইজী ও খেম্‌টার নাচ হইয়া গিয়াছে, এখন কিন্তু এ গৃহের সেরূপ নাচতামাসা একবারেই বন্ধ হইয়াছে। আরো দুই একটা যে ঘর আছে, পাঠকপাঠিকাগণের বিরক্তিকর হইবার ভয়ে আমরা এস্থলে আর সে সকলের কোন উল্লেখই করিব না।

এই মহলের পরেই অন্দর মহল। ইহা ত্রিতল এবং ইহাতে বহু সংখ্যক গৃহও আছে। আমরা নিম্ন ও মধ্যতলের বিষয় কোন রূপ বর্ণনা না করিয়া ত্রিতলের একটি মাত্র প্রকোষ্ঠের বর্ণনা করিব। তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের এই পরিচ্ছেদেরও উপসংহার হইবে, কারণ আমরা বুঝিয়াছি যে এরূপ দীর্ঘ বর্ণনা অনেক পাঠকপাঠিকার ভাল লাগিতেছে না। বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে আমরাও এরূপ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতাম না। পাঠকপাঠিকাগণ একথা স্মরণ করিয়া রাখিবেন যে, কেবল পুস্তকের পাতা বাড়াইবার জন্য আমরা বাজে কথা কখনই বলি

না। এ পরিচ্ছেদ যাঁহাদের ভাল না লাগিবে, তাঁহারা ইহা বাদ দিয়াও যাইতে পারেন।

ত্রিতলের এই প্রকোষ্ঠ গৃহস্বামীর শয়নগৃহ। রৌপ্যনির্ম্মিত ঐ শুভ্র খাটখানি দেখিলেই একথা আর কাহাকেও প্রকাশ করিয়া বলিবার আবশ্যক হয় না। প্রথমে আমরা এই খাট খানির বিষয় দুই এক কথা বলিব। এখানি শিল্পকারের যে আশ্চর্য্য শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বর্ণনায় প্রকাশ করা যায় না। খাটের চারিটী পায়াতে চারিটী পক্ষযুক্ত পরী যেন সেই খাটখানি স্কন্ধে করিয়া ধরিয়া রহিয়াছে। পরীর মস্তকের উপর যে ডাণ্ডা রহিয়াছে, তাহার উপর এক একটী সুন্দর পক্ষী বসিয়া নখের দ্বারা ধৃত কোন ফল খাইতেছিল, এখন সেই আহারে কোনরূপ বাধা পাইয়া যেন পক্ষীটী উড়িবার উপক্রম করিয়াছে। খাটের উপর নানা রঙ্গে চিত্রবিচিত্র সিল্কের এক সুন্দর মোশারি শোভা পাইতেছে। মোশারীর চারি ধারে বেনারসী জরীর সুন্দর ঝালর ঝুলিতেছে। আর এস্থলে সেই দুগ্ধফেণনিভ শয্যার উল্লেখ না করিলেও চলিতে পারে। মোশারীর ভিতর একখানি সুন্দর টানা পাখাও আছে, সে পাখা এক নূতন আবিষ্কৃত কলে টানা হইয়া থাকে।

এই গৃহে গৃহশোভার উপযোগী এত ছোট বড় সুন্দর বস্তু আছে যে, আমরা কোন্‌টীকে রাখিয়া কোনটির বিষয় উল্লেখ করিব, তাহা ভাবিরা স্থির করিতে পারিতেছি না। অন্যান্য আস্‌বাবের মধ্যে একখানি বহুমূল্য এবং নানা রত্নখচিত স্বর্ণ টেবেল, একখানি রৌপ্যনির্ম্মিত সোফা, দুই খানি চেয়ার

প্রভৃতির বিষয় আমারা এস্থলে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সোমনাথ নরেন্দ্র ও লোকনাথকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যেক মহ-লের এই সমস্ত দর্শনীয় বিষয় সকল দেখাইতে লাগিলেন। লোকনাথ মনে করিতে লাগিলেন যেন, স্বপ্নে তিনি এক স্বর্গ-ধামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। নরেন্দ্রনাথও বিস্মিত, বিরামপুরে আসিয়া যে তিনি এরূপ দৃশ্য দেখিবেন, স্বপ্নেও তিনি এ কথা মনে ভাবেন নাই। এ সময় সোমনাথের মনে কোন-রূপ অহঙ্কার ছিল না, রাজবাটী দেখিবার জন্য লোকনাথ ও নরেন্দ্রনাথ উভয়েই উৎসুক, কেবল তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সোমনাথ বিনীতভাবে একজন সামান্য ভৃত্যের ন্যায় এই সকল দেখাইতেছিলেন।

গৃহ দেবদেবীগণকে প্রণাম করা হইয়া গেলেই সোমনাথ লীলাময়ীকে অন্দরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, সুতরাং লীলাময়ী এখন সোমনাথের সঙ্গে ছিল না। সোমনাথ যতক্ষণ নরেন্দ্রনাথ এবং লোকনাথকে এই সকল রাজঐশ্বর্য্য দেখাইতেছিলেন, ততক্ষণ কাহার মুখে কোন কথাই ছিল না। সমস্ত মহল দেখা শেষ হইয়া গেলে লোকনাথ সোমনাথকে বলিল—"হাঁ বাপু, এ রাজার সঙ্গে তোমার কিরূপ সম্পর্ক ?"

সোমনাথ ঈষৎ হাসিয়া নিরুত্তর রহিলেন, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ

তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন—"রাজা সোমনাথ বাবুর একজন বিশেষ বন্ধু, এবং তিনি এঁকে যথেষ্ট ভাল বেসেও থাকেন।"

লোক। কই রাজাকেত দেখ্‌লাম না, সকলইত রাজার মতন আমার বাবাজীকে সম্মান কর্‌ছে দেখ্‌ছি।

নরে। রাজা ভাল বাসেন বলেই রাজকর্ম্মচারীরা এরূপ সম্মান করে থাকেন।

লোক। আমার সোমনাথ যে একজন এতবড় রাজার এরূপ প্রিয়পাত্র, তাত তুমি আমায় পূর্ব্বে কখন বল নাই।

নরে। সে কথা পূর্ব্বে বল্‌লে কি ঘোষজা মহাশয় আমার কথায় বিশ্বাস কর্‌তেন?

লোক। তোমার কথায় বিশ্বাস করেইত বাপু, আমি আমার লীলার বিয়ে দিয়েছি।

নরে। আমার মুখে শুনে বিশ্বাস করার চেয়ে নিজের চক্ষে দেখে বিশ্বাস করা ভাল নয় কি?

লোক। হাঁ—সে কথা যাক্‌। আমার একবার রাজাকে দেখ্‌বার সাধ হয়েছে। লোকে যে রাজা—রাজা করে, রাজা কি আমাদের মত মানুষ?

নরেন্দ্রনাথ লোকনাথের সরল হৃদয়ের এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আপ্‌নার কি অনুমান হয়?"

লোক। আমি ত বাবু, রাজা কখন দেখিনি কেমন করে বল্‌বো? তবে যতদূর শুনেছি, আর যা ঐশ্বর্য্য স্বচক্ষে দেখ্‌লাম, তাতে আমাদের মত মানুষ বলেত বোধ হয় না।

এই সময় সোমনাথ বাবু বলিলেন—"কাল সমস্ত রাত্রি গাড়ীতে আপ্‌নাদের বড়ই কষ্ট হয়েছে, এখন একটু বিশ্রাম করে

স্নানাহার করুন, আহারের পর রাজা ও রাণী উভয়ে আপনাকে প্রণাম করে আপনার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করবে।"

লোকনাথ বিস্মিত হইয়া বলিল—"সে কি! রাজারাণী আমায় প্রণাম কর্‌বে!"

সোমনাথ একথার কোন উত্তর দিতে পারিতেছেন না দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ বলিলেন—"আপ্‌নি সোমনাথের শ্বশুর, রাজা সোমনাথকে ছোটভাইয়ের মত ভাল বাসেন, সুতরাং আপনি রাজারও শ্বশুর। তবে আপনাকে প্রণাম কর্‌বেন না কেন?"

লোক। রাজাদের কি আমাদের মত লোককে প্রণাম কর্‌তে আছে? আমি তবে রাজার কাছে যাব না।

নরে। আপ্‌নি যে সোমনাথের শ্বশুর,—এ কথা আপনাকে কতবার মনে করে দেবো?

লোক। আর তিনি যে রাজা একথা আমি কি করে ভুলে যাব?

নরে। রাজা হলেনই বা? রাজারা কি দেবতা ব্রাহ্মণ ও গুরুজনকে প্রণাম করে না।

লোক। কে জানে বাপু, তোমরাই জান। আমার কিন্তু এখন আবার রাজার কাছে যেতে বড় ভয় হচ্ছে।

এইবার সোমনাথ বলিলেন—"আপনার কোন ভয় নাই, এই বাড়ীর রাজা ও রাণী আপনাকে পিতার ন্যায় ভক্তি কর্‌বে, আর অনুগত ভৃত্যের ন্যায় সেবা কর্‌বে। এখানে আপ্‌নার কোনরূপ ভয়ের কারণ নাই।"

লোক। কে জানে বাপু, এ কি রকম রাজা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। একবার দূর থেকে দেখ্‌বার সাধ হয়েছিল

বইত নয়, নইলে রাজার সাম্‌নে কি আমারা দাঁড়াতে পারি? আচ্ছা আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি, যিনি রাজার রাণী তিনি আমার সাম্‌নে বেরুবেন কেন?

নরেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন—"তিনি ত আর বাহিরে আস্‌বেন না, অন্দরেই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বেন।"

লোকনাথ বিস্মিত হইয়া বলিল—"সে কি! আমি রাজার অন্দরে যাব? রাজার অন্দরে গেলে গর্দ্দান যায় যে!"

নরে। কেন আপনি ত এই মাত্র রাজার অন্দরে বেড়িয়ে এলেন। তেতোলার যে ঘরে রূপার খাট আর সোণার টেবেল দেখে মোহিত হয়েছিলেন, সেইত রাজার অন্দরের শোবার ঘর।

লোক। কে জানে বাপু, আমিত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

সোমনাথ এইবার বলিলেন—"একে কাল সমস্ত রাত্রি কষ্টে গিয়েছে, আর আজ এত বেলা পর্য্যন্ত কষ্ট করে সমস্ত দেখে বেড়ি য়েছেন, এখন একটু বিশ্রাম কর্‌বেন চলুন।"

লোকনাথ উত্তর করিল—"কষ্ট কিরে বাপু? চেঁড়া কাঁথায় ঘরে শুয়ে থাক্‌তাম, তা নইলে কেমন সুন্দর গাড়ীর ভিতর কেমন নরম গদির উপর সমস্ত রাত্রি ঘুমিয়ে এসেছি, তার পর এখানে তোমাদের রাজার বাড়ী দেখে যে আমোদ হয়েছে, তা আর মুখে বল্‌বার নয়—এতে আবার কষ্ট কিরে বাপু?"

সোম। তবে বেলা হয়েছে স্নানাহার কর্‌বেন চলুন। আহারের পর রাজা আপনাকে সংবাদ দিয়ে তখন অন্দরে নিয়ে যাবে।

তখন আর অন্য কথা না কহিয়া নরেন্দ্রনাথ ও লোকনাথ

উভয়েই মনে মনে কি চিন্তা করিতে করিতে সোমনাথের সঙ্গে স্নানাহারের উদ্দেশে চলিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

লীলাময়ীর জন্য আমাদের প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে, এই বার আমরা অন্দরে গিয়া একবার লীলার সংবাদ লইব।

ষ্টেসন হইতে লীলা রুদ্ধ পাল্কীর মধ্যে আসিয়াছিল, সুতরাং লীলা ষ্টেসনের সেই সমারোহ ব্যাপার কিছুই স্বচক্ষে দেখে নাই, তবে বাদ্যকরগণের বাদ্যরব এবং অন্যান্য লোকজনের কোলাহলে লীলা কতকটা ভীতা হইয়া পড়িয়াছিল। যখন রাজবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখনও পাল্কীর দ্বার রুদ্ধ, সুতরাং সে সময় লীলা যে কিরূপ অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। গৃহদেবদেবীগণকে প্রণাম করিবার সময়ও লীলা কোন দিকে চায় নাই। তাহার পর যখন লীলা অন্দরে প্রবেশ করিয়া পাল্কী হইতে বাহিরে আসিল, তখন চকিতের মধ্যে সেই অট্টালিকা দেখিয়া লীলা বিস্মিত হইল। এত বড় প্রকাণ্ড অট্টালিকা লীলা জীবনে কখন দেখে নাই। লীলা গরীবের কন্যা, লীলার পিতার একখানি মাত্র পর্ণকুঠির, সুতরাং রাজ অন্তঃপুরের সেই ত্রিতল অট্টালিকা দেখিয়া লীলা যে বিস্মিত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

তাহার পর যখন লীলা আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত শয়নকক্ষে অতি যত্নের সহিত আনীত হইল, তখন সেই গৃহের আস্‌বাবাদি

দেখিয়া লীলার সেই ক্ষুদ্র হৃদয় ভয়ে আলোড়িত হইয়া উঠিল। তাহার প্রাণ আতঙ্গে পূর্ণ হইয়া গেল। লীলা ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টে চারিদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিল, সেই রৌপ্য খাট ও সুবর্ণ টেবিল প্রভৃতির চাক্‌চিক্যে তাহার চক্ষু যেন ঝল্‌সাইয়া যাইতে লাগিল।

লীলা এইরূপ ভীতিকম্পিতহৃদয়ে বসিয়া রহিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ তাহার মনে পড়িল যে শ্বশুরালয়ে আসিবা মাত্র যে সকল স্ত্রীলোক তাহাকে এত যত্ন করিয়া পাল্কী হইতে তুলিল, তাহাদিগকে নমস্কার করিতে লীলা ভুলিয়া গিয়াছে। জননী আসিবার সময় তাহাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, লীলা এত শীঘ্র তাহা কিরূপে ভুলিয়া গেল, বুঝিতে পারিল না। সে সকল স্ত্রীলোক এখনও নিকটে ছিল, এইবার লীলা তাড়াতাড়ি তাহাদিগকে নমস্কার করিতে গেল, কিন্তু তাহারা লীলাকে নমস্কার করিতে নিষেধ করিয়া বলিল—"আমাদিগকে নমস্কার কর্‌তে নাই, আমরা যে তোমার দাসী।"

লীলাত অবাক্! কেবল ইহাই নহে। এইবার কোথা হইতে নববধূরে দেখিবার জন্য অনেক স্ত্রীপুরুষ আসিল। প্রথমে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের স্ত্রীপুরুষগণ আশীর্ব্বাদ করিল, তাহার পর অন্যান্য জাতীয় স্ত্রীপুরুষগণও দর্শনী দিল, সামান্য দাসদাসী পর্য্যন্তও কেহই বাদ গেল না। এই আশীর্ব্বাদী ও দর্শনীব্যাপারে এত সুবর্ণ ও রজত মুদ্রা স্তূপাকার হইল যে, লীলাময়ী তাহা দেখিয়া এ ঘটনাকে স্বপ্ন ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারিল না। দরিদ্র লোকনাথের কন্যা এত মোহর ও টাকার বিষয় কখন মনেও কল্পনা করে নাই!

এইবার দুইজন দাসী আসিয়া লীলাকে সৌগন্ধযুক্ত তৈল মাথাইয়া দিল। অন্য দুইজন দাসী গাত্র মার্জ্জন করিয়া উত্তমরূপে স্নান করাইল। স্নান শেষ হইয়া গেলে একখানি স্বর্ণথালে নানাবিধ সুখাদ্য মিষ্টান্ন লীলাকে জলযোগ করিতে দেওয়া হইল। লীলা কিছুই খাইতে পারিল না। তখন তাহার প্রাণের ভিতর কি জানি কেন ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। আর এই সকল ঘটনা সত্য না স্বপ্ন লীলা তখন কেবল ইহাই চিন্তা করিতেছিল। চিন্তা কাহাকে বলে লীলা এত দিন জানিত না, এইবার সেই চিন্তা ধীরে ধীরে তাহার কোমল হৃদয়ে প্রবেশ করিল।

অল্পক্ষণ পরেই আবার এক বাক্স অলঙ্কার আনিয়া দুইজনে লীলাকে পরাইতে আরম্ভ করিল। তাহার মধ্যে অনেক জড়োয়া গহনাও ছিল। লীলা ত অবাক্! সে জীবনে কখন সেরূপ বহুমূল্য অলঙ্কার চক্ষে দেখে নাই। লীলা শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে, এখানে তাহার কোনরূপ স্বাধীনতা থাকিতে পারে না, সুতরাং তাহাকে যে যাহা বলিতেছে, লীলা ভয়ে ভয়ে তাহাই করিতেছে। দাসীগণ যেখানে বসিতে বলে, লীলা সেইখানেই বসিয়া থাকে। যতক্ষণ তাহাকে সেখান হইতে উঠিতে না বলা হয়, ততক্ষণ লীলার উঠিতে সাহস হয় না। যখন দুইজন দাসী আসিয়া সেই বহুমূল্য অলঙ্কার রাশি লীলার সম্মুখে রাখিল, তখন কি জানি কেন সেই অলঙ্কার রাশি দেখিয়া লীলার কিছু মাত্র আনন্দের উদয় হইল না, বরং ভয়ে লীলা এক গা ঘামিয়া উঠিল; আর সে সময় তাহার প্রাণের ভিতর যেন ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দ হইতে লাগিল। দাসীদ্বয় ক্রমে ক্রমে যে যে অঙ্গে অলঙ্কার

পরাইয়া দিল, লীলার সেই সেই অঙ্গ ভয়ানক ভারবোধ হইল—যেন পরের অঙ্গ বলিয়া অনুভব হইতে লাগিল। একে একে সমস্ত অলঙ্কার পরা শেষ হইয়া গেলে, লীলার ভয়ানক যন্ত্রণাবোধ হইল। তাহার মাথা ঘুরিতেছিল, এখন সর্ব্বশরীর যেন ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। তত্রাচ লীলা কাহাকেও কোন কথা বলিতে সাহস করিল না।

এই সময় সোমনাথ সেই গৃহে প্রবেশ করিল, দাসীগণ সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। লীলাময়ী তাড়াতাড়ি ঘোম্টা টানিয়া দিল। তাহার পর দাসীগণ সে গৃহ হইতে একে একে সকলই চলিয়া গেল। এক লীলাময়ী ব্যতীত অন্য কেহ সে গৃহে রহিল না। কিন্তু লীলা এখনও ঘোম্টা খোলে নাই, এখনও একবার মুখ তুলিয়া সোমনাথের প্রতি চাহিয়া দেখে নাই। সোমনাথ লীলার নিকটে একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল, এবং ধীরে ধীরে লীলার ঘোমটা খুলিয়া দিল। এইবার লীলা সোমনাথের প্রতি চাহিয়া দেখিল, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় সোমনাথকে সামান্য পরিচ্ছদে দেখিল না, সোমনাথের এরূপ বেশভূষা দেখিয়া লীলা আশ্চর্য্য হইয়া অনেকক্ষণ তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। সোমনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"কি লীলা, তুমি কি আমায় চিন্তে পার নাই?"

লীলা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া উত্তর করিল—"চিন্তে পার্‌ব না কেন? তুমি আমায় কোথায় এনেছ? এত বড় বাড়ী, এত ঐশ্বর্য্য, এই সব গহনা, টাকা, মোহর—এ সব কার?"

সোমনাথ পুনরায় ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল—"এ সকলই তোমার লীলা।"

লীলা ত অবাক্! তাহার মুখে আর কথা নাই। ঐ দেখ, বিস্মিতনেত্রে সোমনাথের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। সোমনাথ লীলার চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া বলিল—"লীলা, আমার কথা কি তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?"

লীলা উত্তর করিল—"আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, আমার মাথা যেন কেমন ঘুর্‌ছে।"

এই কথা কয়েকটী বলিতে বলিতেই লীলা সেই খানে বসিয়া পড়িল, সোমনাথ আপন উরুতে লীলার মস্তক রাখিয়া তাহাকে শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পর লীলা একটু সুস্থ হইল। সুস্থ হইয়াই লীলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, সোমনাথ আশ্চর্য্য হইয়া লীলার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। লীলা এইবার প্রশ্ন করিল—"আমার বাবা কোথায়? বাবাকে দেখ্‌বার জন্য আমার প্রাণ বড় কেমন কর্‌ছে।"

সোমনাথও একটু স্থির হইয়া পুনরায় চেয়ারে উপবেশন করিল, এবং লীলাকে আদর করিয়া নিকটে আনিয়া বলিল—"তোমার বাবা এখনি এখানে আস্‌বেন, আমি তাঁকে এখানে আস্‌বার জন্য সংবাদ পাঠিয়ে দিয়েছি।"

এই সময় দরজার পরদা নড়িয়া উঠিল, প্রথমে নরেন্দ্র নাথ এবং তাঁহারই পশ্চাতে লোকনাথ সেই গৃহে প্রবেশ করিল। নরেন্দ্রনাথ প্রবেশ করিয়াই ঈষৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া লোকনাথকে বলিলেন—"আপ্‌নি যে রাজা ও রাণী দেখ্‌বার জন্য এত অধৈর্য্য হয়েছিলেন, এই সেই রাজা ও রাণী।"

লোকনাথ প্রথমে কম্পিতহৃদয়ে একবার নরেন্দ্রনাথের প্রদর্শিত রাজা ও রাণীর প্রতি চাহিল। কিন্তু একি! লোকনাথ কাহাকে দেখিতেছে? লোকনাথের চক্ষুকে লোকনাথ কখনই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না! লোকনাথ অবাক্ হইয়া মনে মনে ভাবিতেছে—"এঁরাই রাজা ও রাণী! আমার জামাতা সোমনাথই তবে এই দেশের রাজা, আর আমার দুঃখিনী কন্যা লীলাময়ী কি তবে রাজরাণী হলো?"

দরিদ্র লোকনাথের এরূপ বিস্ময়ভাব দেখিয়া রাজা সোমনাথ পর্য্যন্তও থতমত খাইয়া গিয়াছেন। ঐ দেখ, লোকনাথকে অভ্যর্থনা করিতে ভুলিয়া গিয়া তিনিও অবাক্ হইয়া চেয়ারে বসিয়া রহিয়াছেন। আর লীলাময়ী?' লীলাময়ী। অপর ব্যক্তিকে সেই গৃহমধ্যে আসিতে দেখিয়া প্রথমে অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু পিতা আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া আর ততদূর লজ্জা রহিল না। লীলা অনেকক্ষণ পিতাকে দেখে নাই, তাঁহাকে দেখিবার জন্য লীলা বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল, সেই কারণ এখন অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতেই সলজ্জভাবে পিতাকে দেখিতেছিল। এতক্ষণ পরে সোমনাথের চৈতন্য হইল, তখন সোমনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া লোকনাথ ও নরেন্দ্র নাথকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল, এবং সস্ত্রীক লোকনাথকে প্রণাম করিল।

লোকনাথ যাহা স্বপ্নেও কখন ভাবে নাই, আজ তাহার অদৃষ্টে তাহাই ঘটিয়াছে। লোকনাথের আনন্দের আজ সীমা নাই, অবিরল আনন্দাশ্রু তাহার গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িতেছে। সংসারের কোন কথাই এখন আর লোকনাথের মনে স্থান পায়

নাই, লোকনাথ এখন কেবল ভাবিতেছিল—"আমার দুঃখিনী লীলা এখন রাজার রাণী!"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

দরিদ্র লোকনাথের কন্যা লীলাময়ী এখন অতুল ধনের অধিকারী বিরামপুরের শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজা সোমনাথ রায় বাহাদুরের সহধর্ম্মিণী! লোকনাথের আনন্দের সীমা নাই। ভার্য্যা বিন্দুবাসিনীকে পত্রযোগে তৎক্ষণাৎ এই শুভসংবাদ পাঠান হইয়াছিল; এবং লীলাময়ীর বিশেষ অনুরোধে সে পত্রে একবার বিন্দুবাসিনীকে এখানে আসিবার জন্য অনুরোধও করা হইয়াছিল, কারণ পল্লীগ্রামের শাশুড়ীরা অত্যন্ত দরিদ্র হইলেও সহজে জামাতার বাড়ী আসিতে কথনই স্বীকার করে না, এবং শ্বশুরেরাও ইহাতে বিশেষ অপমান বোধ করেন। কিন্তু লীলাময়ী তাহার পিতাকে এরূপ জেদ করিয়া ধরিল, এবং তাহার পিতাও এরূপ আনন্দে অধীর হইয়া পড়িয়াছিল যে, তিনি স্বহস্তেই এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

লোকনাথের আনন্দের সীমা ছিল না বটে, কিন্তু লীলাময়ী তাহার অবস্থার এরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনে কিছুমাত্র আনন্দিত হয় নাই। বরং লীলাময়ীর চিরপ্রফুল্ল মনের সেই প্রফুল্লতা এখন একবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থাপরিবর্ত্তনে লীলাময়ীর মনের অবস্থার কেন যে এরূপ পরিবর্ত্তন হইল, তাহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। লীলা

অতি শৈশব অবস্থা হইতে জননীর নিকট উপদেশ পাইয়াছিল যে, শ্বশুরালয়ে গিয়া গুরুজনের সেবা এবং সাংসারিক সমস্ত কাজকর্ম্ম স্বহস্তে না করিলে স্ত্রীলোকের নিন্দার সীমা থাকে না। লীলার বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে সকল উপদেশ তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। লীলা এখন শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে, জননীর সে সকল উপদেশ পালন করিতেও প্রস্তুত রহিয়াছে, কিন্তু এখন তাহাকে কাহাকেও সেবা করিতে বা সাংসারিক কোন কাজ কর্ম্ম করিতে দেওয়া দূরে থাকুক্, তাহারই সেবা করিবার জন্য ২০।২৫ জন দাসী সর্ব্বদাই অপেক্ষায় থাকিত !

পিত্রালয়ে লীলাময়ী অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া পুষ্করণীতে গিয়া হাত মুখ ধুইয়া আসিত, তাহার পর ঘর নিকোনা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা, কুট্‌নো কোটা, বাট্‌না বাটা প্রভৃতি সাংসারিক কার্য্য সকল স্বহস্তে করিত। ইদানী লীলাময়ী রাঁধিতেও শিখিয়াছিল, সুতরাং কোন কোন দিন এই সকল কাজ কর্ম্মের পর স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়াও পিতা মাতাকে অগ্রে ভোজন করাইত। সে দিন তাঁহাদের ভোজনাবশিষ্ট যাহা কিছু থাকিত, তাহাই মহাহ্লাদে ভোজন করিয়া লীলা অপার সুখ অনুভব করিত। আহারান্তে পুনরায় পুষ্করণী হইতে বাসনগুলি মাজিয়া ঘরে তুলিয়া রাখিয়া তবে একটু বিশ্রাম করিবার অবসর পাইত। এই অবসর সময়েও লীলা হয় তুলা পিঁজিতে বসিত, না হয় জননীর নিকট চর্‌কা কাটিতে শিখিত। বৈকালে জলতোলা, গাছে জল দেওয়া, প্রভৃতি লীলার দৈনিক কার্য্য ছিল, তাহার পর সন্ধ্যার মধ্যেই রন্ধনাদি শেষ

করিয়া জনক জননীকে আহার করাইয়া নিশ্চিন্ত হইত। তৈলের অভাবে প্রদীপ জ্বালিতে পারিত না, সেই কারণ সন্ধ্যার মধ্যেই সমস্ত কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া ফেলিত; তবে যে দিন সন্ধ্যার সময় জ্যোৎস্না উঠিত, সেদিন লীলাময়ীর আনন্দের আর সীমা থাকিত না, বালিকা সেই জ্যোৎস্নাতে আহ্লাদে সূতা কাটিতে বসিত, কারণ নিজহস্তে সূতা কাটিয়া সেই সূতার কাপড় প্রস্তুত করিয়া পরিতে লীলা বড়ই ভালবাসিত।

এইত গেল লীলার কুমারী অবস্থার দৈনিক কার্য্যের বিবরণ। এখন ইহার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার কার্য্যবিবরণ একবার তুলনা করিয়া দেখা যাউক। এখন লীলা সেরূপ প্রত্যুষে উঠিতে পারে না, কারণ একে অধিক রাত্রে শয়ন করিতে হয়, তাহার উপর আবার মনের সেরূপ প্রফুল্লতা ছিল না বলিয়াও রাত্রে পূর্ব্বের ন্যায় সুনিদ্রা হইত না, হয়ত অনেক কষ্টে ভোরের সময়ই ঘুমাইয়া পড়িত। লীলা শয্যা হইতে উঠিয়াই দেখিত যে, তাহার মুখ ধুইবার জল, দন্তমার্জ্জন, তোয়ালে প্রভৃতি লইয়া দুইজন দাসী অপেক্ষা করিতেছে। লীলাকে সহস্তে মুখ ধুইতে পর্য্যন্তও হইত না, এক জন জল দিত, এবং অন্য জন মুখ ধোয়াইয়া দিত। মুখ প্রক্ষালনাদি কার্য্য শেষ করিয়া লীলাময়ী আপনার নির্দ্দিষ্ট গৃহে আসিয়া দেখিত যে, তথায় একজন দাসী দুগ্ধ, মাখম এবং অন্যান্য নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ একখানি রৌপ্য থাল লইয়া লীলার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর লীলার সেরূপ ক্ষুধা ছিল না, সুতরাং লীলা জলযোগে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও সেই দাসী তাহাকে আদর করিয়া এবং সময়ে সময়ে জোর করিয়াও খাওয়াইয়া দিত। জলযোগের

পর লীলাকে একস্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইত, কোনরূপ কাজকর্ম্ম করিতে লীলা পাইত না, এত চেষ্টা করিত, তত্রাচ তাহাকে কেহ কোন কাজ কর্ম্ম করিতে দিত না।

স্নানের সময় হইলে দুইজন দাসী লীলাকে সুগন্ধী তৈল মাথাইতে আরম্ভ করিত। লীলা দাসীদিগকে পর্য্যন্ত ভয় করিত, সুতরাং মনে মনে বিরক্ত হইলেও মুখে সে ভাব প্রকাশ করিতে পারিত না। তাহার পর সেই দুইজন দাসী তাহাকে সাবনাদি মাথাইয়া উত্তমরূপে স্নান করাইয়া দিত, আর একজন দাসী উত্তম বস্ত্রাদি লইয়া সেইথানে অপেক্ষা করিত। স্নানের পর স্বর্ণথালে শতব্যঞ্জন সুশোভিত উত্তম চাউলের অন্ন লীলার আহারের জন্য প্রস্তুত থাকিত। সে সকল দেখিয়া লীলার উদর পূর্ণ হইয়া যাইত, সুতরাং লীলা কিছুই আহার করিতে পারিত না।

আহারান্তে লীলার নিদ্রা যাইবার ব্যবস্থা করা হইত, এই সময় দুইজন দাসী তাহাকে ব্যজন করিতে নিযুক্ত ছিল। লীলা বাধ্য হইয়া শয়ন করিত বটে, কিন্তু দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া তাহার অভ্যাস ছিল না, সেই কারণ সে সময় তাহার নিদ্রা হইত না, কেবল শয্যায় শুইয়া ছট্‌পট্ করিত। বৈকালে অনেক-গুলি সঙ্গিনী আসিয়া জুটিত, তাহাদের মধ্যে লীলার সমবয়স্কাও তিন চারি জন ছিল। কিন্তু তাহারা যে উদ্দেশ্যে আসিত, সে উদ্দেশ্য তাহাদের সফল হইত না। তাহাদের মধ্যে কেহ আসিত পুতুল খেলিতে, কেহ আসিত দশপঁচিশ খেলিতে, কেহ আসিত তাস খেলিতে, আর কেহ বা কেবল গল্প করিয়া আমোদ করিতে আসিত। কিন্তু লীলা কোন প্রকার খেলাই

জানিত না, এবং তাহাদের গল্প শুনিয়াও আমোদ অনুভব করিতে পারিত না, সুতরাং তাহারা ক্ষুণ্ণ মনে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গৃহে ফিরিয়া যাইত।

বৈকালে পুনরায় জলযোগের বন্দোবস্ত ছিল, জলযোগের নাম শুনিলেই লীলার প্রাণে বড় ভয় হইত। সন্ধ্যার সময় পুনরায় দাসীরা উত্তমরূপে গাত্র ধৌত করিয়া দিত। লীলা কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দাসীগণের আজ্ঞাবহ হইয়া চলিত, এবং তাহাদিগকে যমের ন্যায় ভয় করিত।

লীলা মনে মনে যে সকল কামনা করিয়া রাখিয়াছিল, শ্বশুরালয়ে আসিয়া তাহার সে সকল কামনা পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু স্বপ্নেও যে সকল কামনা লীলা মনে স্থান দেয় নাই, এখন সেই সকল কামনাই লীলার পূর্ণ হইয়াছে। লীলা জীবনে কখন বহুমূল্য অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের কামনা করে নাই, বিধাতা কিন্তু লীলাকে এই সকলের অধিকারিণী করিয়াছেন। লীলার আশৈশব কামনা ছিল যে সে শ্বশুরালয়ে আসিয়া গুরুজনের সেবা এবং সাংসারিক কাজকর্ম্ম স্বহস্তে করিয়া সকলের নিকট বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিবে, কিন্তু বিধাতা বালিকার সে ক্ষুদ্র কামনা পূর্ণ করেন নাই। শ্বশুরালয়ে আসিয়া লীলা দেখিল এক আহার ও নিদ্রা ভিন্ন তাহাকে আর অন্য কোন কর্ম্মই করিতে হয় নাই।

আর এক কথা—লীলা দরিদ্র পিতার গৃহে অনন্তআকাশবিহারিণী বিহঙ্গমের ন্যায় সম্পূর্ণ স্বাধীনা ছিল, এখানে আসিয়া কিন্তু অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী রাজার রাণী হইয়া যেন স্বর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ ও সম্পূর্ণ পরাধীনা হইয়া পড়িয়াছে। এখন পাঠক-

পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা লোকনাথের ন্যায় লীলার এইরূপ অবস্থাপরিবর্ত্তনে আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলেন, তাঁহারা বলুন দেখি, লীলা কোন্ অবস্থায় সুখী ?

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দরিদ্র লোকনাথের কন্যা লীলাময়ী বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও দিন দিন ক্ষীণা ও মলিনা হইতে লাগিল। পূর্ব্বে লীলা সোমনাথকে সামান্য অবস্থার গৃহস্থ লোক মনে করিয়া ভালবাসিয়া ছিল, এখনও লীলার সে ভালবাসার বিন্দুমাত্রও হ্রাস হয় নাই বটে, কিন্তু এখন সোমনাথকে একজন বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী রাজা জানিতে পারিয়া লীলার সে ভালবাসার সহিত হঠাৎ ভয় ও ভক্তি কিছু অধিক পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বে লীলা সোমনাথকে কেবল ভালবাসিত ও লজ্জা করিত, এখনও তাহাকে সেইরূপই ভালবাসে এবং লজ্জাও কতক পরিমাণে করে বটে,অধিকন্তু লীলা সোমনাথকে অধিক ভয় করে, অধিকন্তু ভক্তি এবং সম্মানও করিয়া থাকে। অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে লীলার নবপ্রণয়ের সহিত অধিক মাত্রায় ভয়, ভক্তি ও সম্মান কিরূপে মিশ্রিত হইয়া গেল, এ রহস্য যিনি বুঝিতে প্রস্তুত নন, তিনি আমাদের লীলার চরিত্র বুঝিতে সক্ষম হইবেন না।

লীলার এরূপ মনের অবস্থা রাজা সোমনাথ কিন্তু ,প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার ধারণাছিল যে, তাঁহার

হৃদয়েশ্বরী লীলা এখন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়া পূর্ব্ব অপেক্ষা সুখী হইয়াছে। রাজা সোমনাথ লীলার পূর্ব্ব দারিদ্রতা স্মরণ করিয়া ব্যথিত হইতেন, সেই কারণ ঐশ্বর্য্যভোগের দ্বারা তাহাকে সুখী করিতেই প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেন। এদিকে দিন দিন লীলা ক্রমেই ক্ষীণা ও মলিনা হইতে লাগিল, তখন রাজা বুঝিলেন যে, লীলার কোনরূপ শারিরীক পীড়া জন্মাইয়াছে, তাহা না হইলে এরূপ যত্নে থাকিয়াও লীলা এরূপ ক্ষীণা ও মলিনা হইবে কেন? এখনও রাজা লীলার মানসিক পীড়ার কোনরূপ অনুসন্ধান পায় নাই, সুতরাং তখন শারিরীক পীড়ার শুশ্রূষার ধূম পড়িয়াগেল। প্রতিদিন বড় বড় ডাক্তার ও কবিরাজগণ আসিয়া পীড়ায় কারণ অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন, কিন্তু ইহাতে ডাক্তার ও কবিরাজগণেরই দর্শনীলাভ হইতে লাগিল, রোগীর কিম্বা দর্শনীদাতার কোন লাভই হইল না। রাজা তখন উদ্বিগ্ন হইলেন।

ক্রমে চিকিৎসকগণ লীলাময়ীর রোগ নিরূপণ করিতে সক্ষম হইল। বৈকালে লীলার প্রত্যহ জ্বর হয়, সে জ্বর সমস্ত রাত্রি ভোগ হইয়া প্রাতে মগ্ন হইয়া থাকে। জ্বরের সঙ্গে কাশিও আছে। চিকিৎসকগণের মতে এ রোগ যক্ষ্মাকাশ। রোগের নাম শুনিয়াই রাজার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল, তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে লীলাময়ী জননীকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছিল, লোকনাথ স্বয়ং পত্র লিখিয়া অনুরোধ করিলে বিন্দুবাসিনী জামাতার বাড়ী আসিতে স্বামীর সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারে নাই। কিন্তু এ অবস্থায় যখন লীলা জননীকে দেখিবার জন্য এতদূর ব্যস্ত

হইয়াছে, আর যখন রাজা সোমনাথের জননী কিম্বা অন্য কোন বিশেষ আত্মীয়া স্ত্রীলোক কেহই নাই, তখন লোকনাথ আর থাকিতে পারিল না। বিন্দুবাসিনীকে আনিবার জন্য স্বয়ং দেশে চলিলেন। নরেন্দ্রনাথ অনেক দিন এখানে আসিয়াছেন সুতরাং তিনিও একবার দেশে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা সোমনাথ তাঁহাকে এ সময় ছাড়িলেন না।

রাজা সোমনাথ সমস্ত কাজের ভার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর উপর দিয়া স্বয়ং লীলাময়ীর শুশ্রূষায় দিবারাত্র নিযুক্ত। শত শত দাসদাসী থাকিলেও রাজার এ সম্বন্ধে কাহাকে বিশ্বাস হয় না। নরেন্দ্রনাথকেও সর্ব্বদাই রাজার নিকট থাকিতে হইত. এ সময় এক নরেন্দ্রনাথ এবং চিকিৎসকগণ ভিন্ন রাজার সহিত আর কাহার সহজে সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল।

এক দিন বৈকালে রাজা লীলার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন, অনেক সময় রাজা এইরূপ চাহিয়াই থাকিতেন। তিনি দেখিলেন লীলার সেই সুন্দর মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সে মুখের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় নাই, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা সে সৌন্দর্য্য যেন বৃদ্ধি পাইয়াছে। লীলার সেই তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ এখন রক্তাভাবে সাদা ফ্যাকাশে হইলেও রাজার চক্ষে সে বর্ণ বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। লীলার সেই সুদীর্ঘ কেশরাশি এখন তৈলাভাবে রুক্ষ হইলেও রাজার চক্ষে সেই সাদা ফ্যাকাশে বর্ণের মুখের কাছে সে কেশরাশি বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। আর সেই চক্ষু, সেই নাক, সেই চিবুক দেখিয়া রাজা সোমনাথের আশা মিটিতেছিল না। রাজা একদৃষ্টে এই সকল

দেখিতেছিলেন, এমন সময় ফোঁটা ফোঁটা চক্ষের জল লীলার গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহা দেখিয়া প্রথমে রাজা বিস্মিত হইলেন, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সেই কয়েক ফোঁটা চক্ষের জলে তাঁহারও চক্ষু অশ্রুজল ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল, তিনি গোপনে সে অশ্রুজল মোচন করিয়া ফেলিলেন এবং সেই গৃহে যে সকল অপরলোক ছিল, তাহাদিগকে বাহিরে যাইতে বলিলেন।

সকলে চলিয়া গেলে, তিনি স্বহস্তে লীলার সেই অশ্রুজল মুছিয়া দিলেন, কিন্তু মুছিয়া দিবা মাত্র আবার পূর্ব্ব অপেক্ষা অধিক মাত্রায় অশ্রুজল আসিয়া গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া ফেলিল। রাজা সোমনাথ আর থাকিতে পারিলেন না, তিনিও কাঁদিয়া ফেলিলেন। কোন গুরুতর কষ্টের কারণ ভিন্ন কেহ কখন রাজাকে কাঁদিতে দেখে নাই।

সোমনাথ কাঁদিলেন—অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিলেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া আপন চক্ষের জল লীলাময়ীর চক্ষের জলের সহিত মিশাইয়া ফেলিলেন। এখন এই চারি চক্ষুর জলে লীলার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া গেল, তাহার পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত ভিজিতে আরম্ভ করিল। উভয়ের এরূপ অবস্থায় নীরবরোদনের গম্ভীর ভাব প্রকাশ করিয়া বলিবার ক্ষমতা আমাদের নাই!

এইবার রাজা সোমনাথের চৈতন্য হইল, তিনি যে নিজে কাঁদিয়া পীড়িতা লীলাময়ীকেও কাঁদাইতেছেন, এ কথা এতক্ষণ তাঁহার মনে ছিল না। রাজার চিত্তসংযম করিবার ক্ষমতাও অসাধারণ, তিনি তৎক্ষণাৎ সুস্থির হইয়া লীলাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—"লীলা, তুমি কাঁদ কেন?"

লীলা প্রথমে এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিল না তখন তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং উত্তর দিবে কিরূপে? অনেক কষ্টে লীলা উত্তর করিল—"তোমায় দেখে।"

সোম। আমায় দেখ্‌লে কেন কান্না পায় লীলা?

লীলা উত্তর করিল—"আর বেশী দিন দেখ্‌তে পাবো না বলে।"

রাজা সোমনাথের সংযত হৃদয় একথা শুনিয়া আবার অস্থির হইল, কিন্তু নিজের হৃদয়ের উপর রাজার বিশেষ প্রভুত্ব ছিল, সুতরাং সে হৃদয় পুনরায় অস্থির হইতে রাজা আর দিল না। কেবল সতৃষ্টনয়নে সেই মুখখানি দেখিতে দেখিতে সোমনাথ বলিল—"আমি তোমার কাছেকি অপরাধ করেছি লীলা, যে তুমি আমায় এত শীঘ্র ত্যাগ করে যাবে?"

লীলা ধীরে ধীরে সোমনাথের হাতখানি আনিয়া আপন বক্ষের উপর রাখিয়া বলিল—"তোমার অপরাধ কি?—সকলই আমার অদৃষ্টের ফল।"

সোম। লীলা, আজ ছমাস মাত্র আমি তোমায় পেয়েছি, এখনও তোমার ঐ সুন্দর মুখ দেখে আমার চখের আশা মেটে নাই, এখনও তোমার ঐ মধুমাখা কথা শুনে আমার কান পরিতৃপ্ত হয় নাই, তুমি ঘুমিয়ে থাক, আমি সমস্ত রাত্রি তোমার মুখের দিকে চেয়ে রাত্রি কাটাই, তোমার মুখ দেখ্‌লে আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না। তোমার কথা শোন্‌বার জন্য আমি সমস্ত কাজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করেছি—এখনও আমার কোন সাধই মেটে নাই] যে লীলা! লীলা—লীলা—এরই মধ্যে——'

আর কথা মুখে আসিল না, এতক্ষণ পরে সোমনাথের হৃদয়ের

বাধ পুনরায় ভাঙ্গিয়া গেল, সে সংযত হৃদয় পুনরায় অস্থির হইয়া পড়িল। পুনরায় অশ্রুজলে লীলার অঙ্গ সিক্ত হইতে লাগিল। দুর্ব্বল লীলা কিন্তু এবার আপনার হৃদয়ের বল দেখাইল। ক্ষুদ্র হস্তে আপন বস্ত্রাঞ্চলে রাজার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল—"তুমি কেঁদ না।"

সোমনাথ তৎক্ষণাৎ একটু সুস্থির হইয়া বলিল—"লীলা, তুমি আমায় ছেড়ে যাবে, আর আমি কাঁদ্‌বো না!"

লীলা পুনরায় বলিল—"তুমি যদি রাজা———"

লীলার মুখে আর কথা আসিল না। সোমনাথ ব্যগ্রতার সহিত বলিল—"বল লীলা, কি বল্‌ছিলে বল।"

লীলা তখন পুনরায় আরম্ভ করিল—"তুমি যদি রাজা না হয়ে একজন আমাদের মতন সামান্য লোক হতে তা হলে—তা হ'লে—"

সোম। আর বলতে হবে না, আমি বুঝেছি—আমি এখন সব বুঝেছি লীলা। আর আমি ধন, ঐশ্চর্য্য, মান, সম্ভ্রম কিছুই চাই না। আমি তোমায় নিয়ে বনবাসী হতেও প্রস্তুত। যেখানে—যে অবস্থায় থাক্‌লে তুমি সুখী হও, এখন আমি সেইখানে তোমায় সেই অবস্থাতেই রাখ্‌বো লীলা।

কথা শুনিয়া লীলার অধরপ্রান্তে ঈষৎ হাসি দেখা দিল, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ যেরূপ হাসে, লীলাও সেইরূপ হাসিল। সোমনাথ সে হাসির অর্থ বুঝিতে পারিল না। কারণ চির-বিচ্ছেদভয়ে তাঁহার হৃদয়ে ধীরে ধীরে যে অন্ধকারের ছায়া আসিয়া পড়িতেছিল, এই হাসির আলোকে সেই ছায়া আর তত স্পষ্ট দেখা গেল না!

লীলাময়ী এই সময় বলিল—"কই আমার মা আজও এলেন না কেন—বাবাত অনেক দিন গিয়েছেন।"

সোম। তিনি আজ তিন দিন গিয়েছেন, কাল নিশ্চয়ই মাকে নিয়ে এখানে এসে পৌঁছিবেন।

লীলা। মা এখানে এলে তাঁকে আমার কাছে আস্‌তে দেবে ত?

সোম। তুমিত এ সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, তুমি যা হুকুম করবে তাই হবে। আর আমার মা নাই, তোমার মা আমারও যে মা। তুমি তাঁর কন্যা, আমি তাঁর পুত্র। আমরা দুজনে মায়ের সেবা করবো।

লীলা। আমি তা বল্‌ছি না—বাবাত এখানে থাক্‌লে সর্ব্বদা আমার কাছে থাক্‌তেন না, তাই আমি জিজ্ঞেস্ কর্‌ছি, মা এখানে এলে তিনি সর্ব্বদা আমার কাছে আস্‌তে পাবেন ত?

সোম। তোমার যা ইচ্ছা তাই হবে লীলা। আর তুমি এরূপ রুগ্নশয্যায় পড়ে থাক্‌লে তিনি কি তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বেন?

লীলা। মা এলে তুমি একটু আরাম পাবে। আমার রাতদিন তোমায় দেখ্‌তে ইচ্ছা করে যে, তাই তোমায় এখান থেকে যেতে বল্‌তে পারি না। তোমার কত কষ্ট হয়!

লীলা। না লীলা, তোমার কাছে বসে থাক্‌তে আমার কোন কষ্ট হয় না।

লীলা। তুমি আমায় এতদূর ভালবাস?

সোম। সে কথা নিজের মুখে বলে তোমায় আর কি জানাব?

লীলা। আমি যে তোমার মুখেই ঐ কথা শুন্‌তে ভাল-বাসি।

সোম। আমার এ ভালবাসার পুরস্কার কি লীলা?

লীলা। ভালবাসার পুরস্কার ভালবাসা বই আবার কি?

অন্ধকারময় নভোমণ্ডলে হঠাৎ পূর্ণিমাশশির উদয় হইলে যেমন হয়, রাজা সোমনাথের হৃদয়াকাশেও সেইরূপ একটি আকস্মিক পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। সোমনাথ অনেক ক্ষণ লীলার মুখের প্রতি চাহিয়া ভাবিতে লাগিল—"ঈশ্বর মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, আজ আমার লীলা বেশ ভাল আছে, আমি সুস্থ অবস্থায়ও এত কথা কখন তাহার মুখে শুনি নাই। আজ তাহার কথা শুনিয়া আমার প্রাণ জুড়াইয়া গেল।"

এই সময় নরেন্দ্র নাথ আসিয়া ডাক্তারের আগমন সংবাদ দিল। তাহার পরমুহূর্ত্তেই একজন ইংরাজ ডাক্তার সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডাক্তার সাহেবকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। ডাক্তার সাহেব আসিয়াই রোগীর অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সোমনাথ অন্যদিন অপেক্ষা প্রফুল্লমনে বলিলেন—"আজ রোগীর অবস্থা বিশেষ ভাল বোধ হয়, অন্য দিন বৈকালে যে জ্বর হয়, আজ ত সে জ্বরের কোন লক্ষণই দেখি না। ডাক্তার সাহেব, আজ তোমার রোগীর মুখে আমি হাসি দেখিয়াছি।"

ডাক্তার সাহেবও তখন হাসিতে হাসিতে রোগীর পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু পরীক্ষা করিতে করিতে ডাক্তার সাহেবের সেই হাসিমুখ ক্রমে মলিন হইয়া গেল। তখন কোন কথা না বলিয়া সাহেব বিষণ্ণ মনে একখানি চেয়ারে আসিয়া বসিলেন।

রাজা তাহা দেখিয়া একটু ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— "কেমন দেখ্‌লেন ?"

ডাক্তার সাহেব তখন মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন— "মন্দ নয়, কিন্তু রোগী বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, আমি যে ঔষধ লিখিয়া দিতেছি, সেই ঔষধ এখনি আনাইয়া খাওয়াইতে হইবে।"

এই কথা বলিয়া ডাক্তার সাহেব তাড়াতাড়ি ঔষধ লিখিয়া নরেন্দ্রবাবুকে দিলেন, নরেন্দ্রবাবু তাড়াতাড়ি ঔষধ আনিতে চলিয়া গেলেন। রাজা সোমনাথ এই সময় বলিলেন— "ডাক্তার সাহেব, আপনি রোগীকে বড় দুর্ব্বল বল্‌ছেন, কিন্তু রোগীকে আজত সেরূপ দুর্ব্বল বলে বোধ হয় না। কেন না এতক্ষণ প্রায় একঘণ্টা ধরে রোগী আমার সঙ্গে কত কথা কয়েছে।"

ডাক্তার সাহেব বলিলেন—"তবে অতক্ষণ ধরে কথা কওয়াতেই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন। এ অবস্থায় কথা কহান ভাল নয়।"

তাহার পর ডাক্তার সাহেব একখানি পুস্তক দেখিতে লাগিলেন, আর রাজা সোমনাথ স্থির হইয়া বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময় নরেন্দ্রনাথ ঔষধ আনিয়া উপস্থিত করিল। ডাক্তার স্বহস্তে ঔষধ সেবন করাইয়া দিলেন, এবং যাইবার সময় বলিলেন—"আধ ঘণ্টার পর রোগীর গা গরম হয় কি না দেখিয়া আমায় সংবাদ করিবেন।"

রাজা সোমনাথ সেই ভাবে এখনও একমনে কি ভাবিতেছেন, নরেন্দ্র নাথ কিন্তু ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি এখন রোগীর অবস্থা কিরূপ দেখ্‌লেন ?"

ডাক্তার সাহেব উত্তর করিলেন—"খুব খারাপ।"

নরে। কেন আজ বৈকালে ত জ্বর হয় নাই।

ডাক্তার। জ্বর হইলে ভাল হইত। মৃত্যুকালে জ্বর থাকে না।

নরেন্দ্রনাথের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, এত শীঘ্র যে এরূপ অমঙ্গল ঘটিবে, তাহা নরেন্দ্রনাথ মনেও করেন নাই। নরেন্দ্রনাথের বুকের ভিতর ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দ হইতে লাগিল। অনেক কষ্টে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কখন্ এরূপ অনিষ্ট আশঙ্কা করেন?"

ডাক্তার সাহেব উত্তর করিলেন—"আজ শেষ রাত্রে, কিম্বা কাল প্রাতে।"

ডাক্তার চলিয়া গেলেন, কিন্তু নরেন্দ্র নাথের আর চলিবার ক্ষমতা রহিল না, মাথা ঘুরিয়া গেল, নরেন্দ্র নাথ সেইখানে বসিয়া পড়িলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ডাক্তার সাহেবের অনুমানই সত্য হইল। সেই দিন রাত্রি দুই প্রহরের পর হঠাৎ একটা সর্দ্দি লীলাময়ীর বুকে আসিয়া বসিল। সেই কারণ রোগীর নিশ্বাস প্রশ্বাসেও কষ্ট হইতে লাগিল। তখন রাজা এবং অন্যান্য সকলেই উদ্বিগ্ন হইলেন। সেই রাত্রেই পুনরায় ডাক্তার আনা হইল, ডাক্তার আসিয়া একটা মালিশের ঔষধ দিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না।

রাত্রি তিনটার পর পীড়া যখন আরো বৃদ্ধি পাইল, তখন সোমনাথ একবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। তিনি যে ঘটনার জন্য এখনও কিছুমাত্র প্রস্তুত নন, বুঝি বা তাহার অদৃষ্টে সেই ঘটনাই ঘটে। সোমনাথের এখনকার মনের অবস্থা বর্ণনাতীত। সোমনাথের প্রাণের যাতনা বর্ণনা করা আমাদের সাধ্য নয়। সোমনাথের নিজের অবস্থা এখন তিনি নিজেই বুঝিতে পারিতেছেন না। দুই মাসের মধ্যেই কি তাহার জীবনের সকল সুখ, সকল আশা ভরসা ফুরাইয়া যাইবে? সোমনাথের মনে একথা যেন স্থান পায় না। সোমনাথ ঈশ্বরের নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহার সুখের বীজ অঙ্কুরিত হইতে না হইতেই তিনি তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিবেন। সোমনাথের হৃদয় এখনও আশাশূন্য নয়। ধন্য আশা!

শেষ রাত্রে রোগীর অবস্থা এরূপ দাঁড়াইল যে, সোমনাথ অনেক চেষ্টা করিয়াও হৃদয়ের মধ্যে সে আশা আর পুষিয়া রাখিতে পারিলেন না। সোমনাথ তখন হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাহার তখনকার সেই শোচনীয় অবস্থার আভাস দিতেও আমরা অক্ষম। কিন্তু এবার এ মৃত্যুমুখ হইতে রোগী বাঁচিয়া গেল, অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই রোগী সাম্‌লাইল। সোমনাথ আবার একটু সুস্থির হইল। আবার তাহার হৃদয়ে আশার উদয় হইল, আমরাও আবার বলি, ধন্য আশা!

ইতঃপূর্ব্বে লীলাময়ীর যে চক্ষু কপালে উঠিয়া গিয়াছিল, সে চক্ষু এখন আবার স্বাভাবিক হইল। এইবার লীলা প্রথমেই সোমনাথের দিকে চাহিল। সে চাউনির আরো একটু অর্থ ছিল, সে চাউনি দেখিয়া সকলেই অনুমান করিল যে, লীলা

সে সোমনাথকে কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছে। সোমনাথ লীলার আরো একটু নিকটে অসিয়া বলিল—"লীলা—লীলা—"

সোমনাথের মুখে আর কথা নাই। সোমনাথ কত কথা বলিবে মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু আর কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। লীলা কিন্তু এইবার কথা কহিল—"আমার মা বাবা কৈ এলেন না?"

সকলেই আগ্রহের সহিত লীলার সে কথা কয়েকটি শুনিল। সোমনাথ উত্তর করিল—"তাঁহারা আজ নিশ্চয়ই আস্‌বেন। লীলা, এখন তুমি কেমন আছ।"

লীলা অতি ক্ষীণ স্বরে পুনরায় বলিল,—"যতক্ষণ আছি তোমায় যেন দেখ্‌তে পাই, আর তোমায় দেখ্‌তে দেখ্‌তে যেন মর্‌তে পারি। তবে এক কষ্ট—মা আর বাবার সঙ্গে বুঝি এ জন্মে আর দেখা হলো না।"

সোমনাথের মাথায় যেন পুনরায় বজ্রাঘাৎ হইল, সোমনাথ বলিল—"লীলা, এরই মধ্যে তুমি আমাদের মায়া কাটালে?"

লীলা আর মুখে কোন কথা না বলিয়া আপনার সেই শীর্ণ ক্ষুদ্র হস্তখানি লইয়া আপনার অদৃষ্ট দেখাইয়া দিল।

গৃহশুদ্ধ সমস্ত লোক অবাক্ হইয়া তাহা দেখিল। কাহার মুখে আর কথা নাই, সমস্ত গৃহ একবারে নিস্তব্ধ। সকলেই আগ্রহের সহিত সেই ক্ষুদ্র মুখখানির প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে।

ক্রমে প্রভাত হইল। আজি যে প্রভাত হইবে এ কথা আর কাহার মনে ছিল না। এমন সময়—"কই আমার লীলা কই-কই আমার মা কই"—রবে চিৎকার করিতে করিতে একজন

উন্মাদিনী যেন সেই গৃহে প্রবেশ করিল, তাহারই পশ্চাতে লোকনাথ! সকলেই আগ্রহের সহিত তাহাদের প্রতি চাহিল লীলাময়ীর দৃষ্টিও সকলের সঙ্গে সঙ্গে সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। লীলাও সেই সময় "মা—মা" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। সে উন্মাদিনী অন্য কেহ নহে—লীলাময়ীর জননী বিন্দুবাসিনী।

বিন্দুবাসিনী দৌড়িয়া গিয়া লীলাকে কোলে করিয়া তুলিতে গেল, সকলে তাহাকে সেরূপ করিতে নিষেধ করিল। বিন্দু চিৎকার করিয়া উঠিল—"মা, একি দেখ্‌ছি মা, তুমি যে আমার রাজরাণী হয়েছ মা। আমি কি দেখ্‌তে এলুম—আর কি দেখ্‌ছি মা।"

লীলা ক্ষীণস্বরে বলিল—"মা—বাবা তোমরা আমায় আশীর্ব্বাদ কর।"

সকলে বিস্মিতনেত্রে দেখিল যে, কথা কয়েকটি বলিতে বলিতেই লীলার গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িল। লোকনাথ এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া একস্থানে দাঁড়াইয়া ছিল, এইবার দৌড়িয়া গিয়া সেই অশ্রুজল মুছাইয়া দিল।

এই সময় লোকনাথ আর বিন্দুবাসিনীকে সকলে একটু স্থির হইতে বলিল; কিন্তু তাহারা স্থির হইবে কি? এই সময় লীলাময়ীর চক্ষুর পাতা আর নড়িতেছিল না। সকলে ব্যগ্র হইয়া দেখিল লীলার চক্ষের আর পলক পড়ে না। সোমনাথ তাড়াতাড়ি চিবুক ধরিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, কিন্তু লীলাকে স্পর্শ করিবামাত্র তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সোমনাথ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"ভাই নরেন, লীলা বুঝি ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল!"

তখন আর কাহার কোন কথা বুঝিতে বাকি রহিল না। একটা ভয়ানক ক্রন্দনের রোল উঠিল।

*   *   *   *   *

লীলার লীলাখেলা ফুরাইয়া গিয়াছে, সেই সঙ্গে রাজা সোমনাথেরও সকলই ফুরাইয়া গিয়াছে, কেবল স্মৃতি আছে! রাজা সোমনাথ এখন সেই স্মৃতির জ্বালায় অস্থির। বিষয়াদি রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত ভার নরেন্দ্রনাথের উপর দিয়া সোমনাথ তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইয়া গেলেন। নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি কাহার কথা শুনিলেন না এবং কতদিনে যে ফিরিয়া আসিবেন সে কথাও কিছু বলিয়া গেলেন না। লোকনাথ ও বিন্দুবাসিনীকে আর দেশে ফিরিয়া যাইতে হইল না, তাহাদের জন্য সোমনাথ বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের সে অবস্থায় সেরূপ কোন বন্দোবস্তের আবশ্যক ছিল না। শোকে লোকনাথের জীবন্মৃত্যু ঘটিয়াছিল, আর বিন্দুবাসিনী ত এখন প্রকৃত উন্মাদিনী! উন্মাদিনীর মুখে কেবল "লীলা আমার রাজরাণী" ভিন্ন আর অন্য কথা কিছু ছিল না!